জ্ঞান ও বিজ্ঞান

37তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

জানুয়ারী : 1984

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণ-সংখ্যা

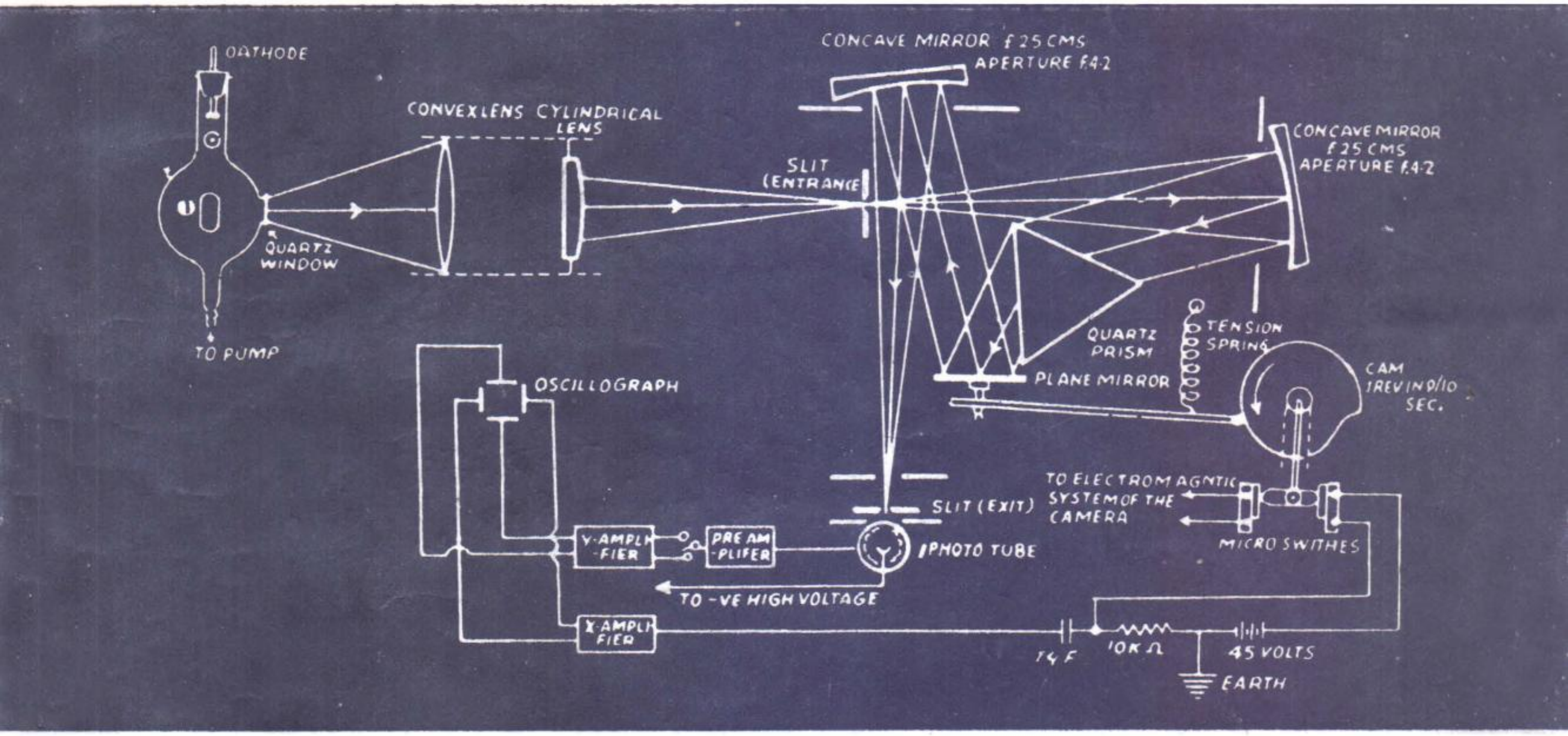

নব্বইতম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
৪. অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

৺জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী, 1984
37তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

উপদেষ্টা : সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সম্পাদক মণ্ডলী : কালিদাস সমাজদার
গুণধর বর্মন
জয়ন্ত বসু
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রতনমোহন খাঁ
শিবচন্দ্র ঘোষ
সুকুমার গুপ্ত

সম্পাদনা সহযোগিতায় :

অনিলকৃষ্ণ রায়, অপরাজিত বসু, অরুণকুমার সেন, দিলীপ বসু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয় কুমার বল, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, মিহিরকুমার ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা সচিব : গুণধর বর্মন

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	1
সত্যদ্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ — জয়ন্ত বসু	
বোস সংখ্যায়ন — পার্থ ঘোষ	3
বনস্পতির ছায়া — সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র	6
মাতৃভাষা — সত্যেন্দ্রনাথ বসু	8
বিজ্ঞান গবেষণা, সৃজনশীলতা ও আচার্য বোস — মহাদেব দত্ত	12
আমার মাস্টারমশাই — জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার	14
বোস-সংখ্যায়নে তৃতীয় প্রবন্ধ — নন্দদুলাল সেনগুপ্ত	18
নতুন 'বোসনে'র সন্ধানে — বিমলেন্দু মিত্র	21
আইনস্টাইনকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি	24
জার্মানীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার ছবি	25
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তাধারা — গুণধর বর্মন	26
সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ চেতনা — রতনমোহন খাঁ	32
প্রফেসর সত্যেন বোস — তপেন রায়	36
সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা-পত্রের তালিকা	38
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর	
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (জীবনের প্রথম দিক) — নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়	39
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন বুঝেছি — শিবচন্দ্র ঘোষ	43
পরিষদ সংবাদ	45
প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে কর্মসচিবের ভাষণ	46

প্রচ্ছদ পরিচিতি : তাপদীপ্তি গবেষণায় একান্তভাবে প্রয়োজনীয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্ভাবিত ও নির্মিত Rapid Scanning Spectrophotometer যন্ত্রটির মডেল। দেশীয় সাজসরঞ্জামের সাহায্যে তাঁর নিজহাতে তৈরী এই সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রটি প্রযুক্তিবিজ্ঞানে আচার্য বসুর এক অমূল্য মৌলিক অবদান। আমাদের দেশে তাপদীপ্তি সম্পর্কিত গবেষণার কাজ কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজেই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। সমগ্র বিজ্ঞান জগতে এই জাতীয় গবেষণা তখন সুলভ ছিল না। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবই ছিল এই গবেষণার প্রধান অন্তরায়। বিজ্ঞান কলেজে এই গবেষণায় লিপ্ত ছাত্রদের সমস্যার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করেই আচার্য বসু কয়েক মাসের চেষ্টায় এই জটিল যন্ত্রটি নির্মাণ করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাপদীপ্তির বর্ণালী বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারা পৃথিবীর গবেষকরা খুবই সচেতন এবং নানাভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। তথাপি এখন পর্যন্ত আচার্য বসুর উদ্ভাবিত এই স্পেক্‌ট্রোফটোমিটারের সমকক্ষ যন্ত্র কেউ নির্মাণ করেছেন বলে জানা নেই। তাই বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হয়েও গবেষণাকার্যে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে ভূয়সী প্রশংসিত। এ বিষয়ে অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ বসু লিখিত "তাপদীপ্তি গবেষণায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান"—প্রবন্ধটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জুলাই-অগাস্ট 1974 সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরিতে এদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তরিকভাবে এগিয়ে এলে এই যন্ত্রের আরও উন্নতিবিধান এবং এই ধরণের অন্যান্য যন্ত্রের উদ্ভাবন ও বহুল ব্যবহার হয়ে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ আরও সহজ ও ব্যাপক হয়ে যেত। কিন্তু সেই আন্তরিকতা আজও দেখা যায় নি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী

অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শুর, বাণীপতি সান্যাল, ভাস্কর রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

উপদেষ্টা মণ্ডলী

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, অনাদিনাথ দাঁ, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুকুমার বসু, বিমলেন্দু মিত্র, বীরেন রায়, বিশ্বরঞ্জন নাগ, রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

প্রতি সংখ্যা : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কার্যকরী সমিতি (1983—85)

সভাপতি : জয়ন্ত বসু

সহ-সভাপতি : কালিদাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, তপেশ্বর বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমোহন খাঁ,

কর্মসচিব : সুকুমার গুপ্ত

সহযোগী কর্মসচিব : উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়

কোষাধ্যক্ষ : শিবচন্দ্র ঘোষ

সদস্য : অনিলকৃষ্ণ রায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, চাণক্য সেন, তপন সাহা, দয়ানন্দ সেন, বলরাম দে, বিজয়কুমার বল, ভোলানাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শশধর বিশ্বাস, সত্যসুন্দর বর্মন, হরিপদ বর্মন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম—1লা জানুয়ারী, 1894 মৃত্যু—4ঠা ফেব্রুয়ারী, 1974

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | জানুয়ারী, 1984 | প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সত্যদ্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ

জয়ন্ত বসু

পৃথিবীতে এমন স্বল্প কয়েকজন মানুষ জন্মেছেন, যাঁরা গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জটিল আবর্তের মধ্যেও যে-কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত মূল সত্যটি দেখতে পান। এই রকমই একজন অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু—তাঁর 'সত্যেন্দ্র' নামটি যে যথার্থই সার্থক, নিঃসংশয়ে বলা চলে এ কথা। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি একদিকে যেমন বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধিশালী করেছে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের দেশের প্রগতিতে দেখিয়েছে আলোর নিশানা। আধুনিক যুগে যে-কোন দেশের সত্যিকারের উন্নতির জন্যে যে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার এবং এই কাজটি সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে, এই সত্যটি উপলব্ধি করে নানান বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে 1948 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—যার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আজ সুদীর্ঘ 36 বছর ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নবইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নববর্ষে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা তাঁর সুমহান স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে নিবেদিত হল।

'বিজ্ঞানের সঙ্কটের' এক সময়ে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠিটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই চাবিকাঠির নামকরণ করা হয় 'বসু সংখ্যায়ন' (Bose Statistics)। আলোক কণাসমষ্টি বা সাধারণভাবে ফোটন কণাসমষ্টির প্রকৃতি বুঝতে পারা গেছে এই সংখ্যায়ন থেকে এবং বিকিরণ সম্পর্কিত মাক্স প্লাঙ্কের বিখ্যাত সূত্রটিকে ত্রুটিহীন ও সুসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় পরবর্তীকালে, যখন দেখা গেল—কেবল ফোটন কণাই নয়, বিশ্বে যত রকম মৌলিক কণা আছে, সেগুলির অর্ধেকের ক্ষেত্রেই এই সংখ্যায়ন প্রযোজ্য। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুযায়ী ঐ কণাগুলিকে বলা হয় 'বোসন'। তাঁর অবদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন ইমারৎ। নাম ঃ কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন।

কোয়াণ্টাম সংখ্যায়ন ছাড়াও একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের মতন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অন্য শাখাতেও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক অবদান রয়েছে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞান এবং জৈব রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণাতেও। নৃতত্ত্ব, জীববিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর ছিল আন্তরিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বহু গবেষক উপকৃত হয়েছেন তাঁর মনীষার দাক্ষিণ্যে—কেউ কোন দুর্বোধ্য সমস্যা নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্মোচিত করে দিতেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আন্তর সত্যটিকে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বহুমুখী বিজ্ঞান-প্রতিভার পরিচয় এই পত্রিকায় আগে পরিবেশিত হয়েছে, তবু নতুন করে কিছু পরিচয় দেওয়া হল পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায়।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হলে এই ভাষায় সর্বস্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চাও যে আবশ্যক, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ এই সহজ সত্যটি আমাদের স্বাধীন দেশের পরাধীনচেতা মানুষদের কাছে বারবার উপস্থাপিত করেছেন। তিনি যেমন অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রশস্ত হৃদয়বান, ছিলেন একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী—ভারতে নবজাগরণের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি নিজে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে স্মারক

বক্তৃতা দিয়েছেন, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করেছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণার কিছু অংশ বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, পরিবেশিত হয়েছে বাংলা ভাষায় তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা সম্বন্ধে আলোচনা।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে যে বিরূপ, এমনকি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে, কালস্রোতে ভেসে গেছে সেই সব অসার বাক্যাবিন্যাস। স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবং গবেষণা-স্তরেও বিজ্ঞানচর্চায় বাংলাভাষার ব্যবহার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে পথিকৃৎ করে যে বিজ্ঞান-আন্দোলন সত্যেন্দ্রনাথ গড়তে চেয়েছিলেন, তা অন্ততঃ আংশিক ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আদর্শ অনুসরণ করে বাংলাভাষায় বহু বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন ইত্যাদি জনমাধ্যমগুলির কিছুটা সচেতনতার ফলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা বহু গুণ প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান-ক্লাব মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারে নিযুক্ত আছে। তবে স্বীকার করতে হবে যে, পরিষদের লক্ষ্য পূর্ণ হতে এখনো অনেক বাকি — আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ। এই পরিস্থিতিতে সবরকম 'সংকোচের বিহ্বলতা' ত্যাগ করে ও 'সংকটের কল্পনাতে' ম্রিয়মাণ না হয়ে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী থাকবো—যদি আমরা সকলে, পরিষদের সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নবইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রতিজ্ঞা নতুন ভাবে গ্রহণ করি, তবে তাই হবে সত্যদ্রষ্টা ও স্বদেশপ্রেমী সত্যেন্দ্রনাথের সুপবিত্র স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ তর্পণ।

"অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞান-চর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ঐ শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। আশা করি বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়াণ্ট, ইণ্টিগ্রেশন—এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক ছাত্ররা কোন বিষয়ে আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বোস সংখ্যায়ন

পার্থ ঘোষ*

"The paper by Bose is the fourth and last of the revolutionary papers of the old quantum theory [the other three are, respectively, by Planck (December 1900), Einstein (1905), and Bohr (1913)]".

'The astounding fact is that Bose was correct on all three counts, (In his paper he commented on none of them). I believe there has been no such successful shot in the dark since Planck introduced the quantum".

—Abraham Pais**

পদার্থবিজ্ঞানের জগতে 1900 খৃস্টাব্দে ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) যে বিপ্লব শুরু করেছিলেন এবং আইনস্টাইন ও নীল্স বোর (Niels Bohr) যাকে পরবর্তীকালে আরও সুদূরপ্রসারী করে তোলেন, সেই প্রাথমিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের শেষ মৌলিক প্রবন্ধটি লেখেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি আমাদের সকলের কাছে সত্যেন বোস বলেই পরিচিত। এই দূরদ্রষ্টা বিজ্ঞানীর অবদান বুঝতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পদার্থবিজ্ঞান যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল সেটিকে আরো ভালো ভাবে বোঝা দরকার।

প্রথমেই জানতে হবে কৃষ্ণবস্তু (black body) কাকে বলে। যে সমস্ত বস্তু তাদের ওপর আপতিত সবরকমের রশ্মিকেই সম্পূর্ণ শোষণ (absorb) করে নিতে পারে, তাদের বলা হয় কৃষ্ণবস্তু। এই সব কৃষ্ণবস্তু আবার যে রশ্মি বিকিরণ (radiate) করে, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই রশ্মির (black body radiation) বর্ণালীর গাণিতিক সূত্রটি আবিষ্কার করেন ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক। প্ল্যাঙ্ক দেখলেন যে, সূত্রটিতে পরীক্ষালব্ধ বর্ণালীর একটি অতি নিখুঁত গাণিতিক বর্ণনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানের ধ্যানধারণা দিয়ে এর কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যদি ধরা যায় যে রশ্মির শোষণ ও বিকিরণ দুটি প্রক্রিয়াই অবিচ্ছিন্ন (continuous) ভাবে না ঘটে ধাপে ধাপে ঘটে এবং এই সমস্ত বিযুক্ত (discrete) প্রক্রিয়ায় রশ্মির শক্তির (E) পরিমাণ তার কম্পাঙ্কের (ν) সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ ν (নিউ) কম্পাঙ্কের রশ্মি কেবল মাত্র $E=h\nu$ (h হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক) পরিমাণেই শোষিত ও বিকীর্ণ হতে পারে, তবেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। এই হল কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রপাত।

শক্তির সঙ্গে কম্পাঙ্কের এই নূতন সম্বন্ধটি পদার্থবিজ্ঞানে একটি গভীর সংকটের সৃষ্টি করে, যাকে 1905 খৃস্টাব্দে আরও গভীরতর করে তোলেন আইনস্টাইন। আলোক-তড়িৎ প্রভাবের (photo-electric effect বা আলোর প্রভাবে ধাতু থেকে ইলেকট্রনের উচ্ছেদ) এক অসামান্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, বস্তু থেকে শক্তি যে শুধু ধাপে ধাপে শোষিত বা বিকীর্ণ হয় তাই নয়, প্রবাহমান অবস্থাতেও তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি যদি $E=h\nu$ শক্তির কণিকাদের সমষ্টি না হয়, তাহলে এই আলোক-তড়িৎ প্রভাব ঘটতেই পারে না। অর্থাৎ, রশ্মির যেমন একটি তরঙ্গরূপ আছে বলে জানা ছিল, তেমনি তার আবার একটি কণিকা রূপও (corpuscular character) আছে। এই শুরু হল তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈতবাদ (wave-particle duality)। সেই যুগে এই বৈপ্লবিক চিন্তা যে সব বিজ্ঞানীর বিশ্বাসযোগ্য হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। আলোক-কণিকার (পরে এগুলির নাম দেওয়া হয় ফোটন) এই ধারণা যে নিছক কল্পনা নয়, তা পরীক্ষার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন কম্পটন (Compton) 1922 খৃস্টাব্দে। ততোদিন অবধি আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে নি।

1924 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্ল্যাঙ্কের সূত্রের যে নানান তাত্ত্বিক নির্ধারণ (derivation) প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই আলোর তরঙ্গ-রূপ ও কণিকা-রূপ দুইয়েরই যুগপৎ ব্যবহার দেখা যায়। যুক্তির দিক দিয়ে এটি নিশ্চয়ই সন্তোষজনক নয়। আলো যদি ফোটনের সমষ্টি হয় তাহলে আলোকে ফোটনদের গ্যাস ভাবতে আপত্তি কোথায়? এই ফোটন গ্যাসের কল্পনা থেকে কি তাহলে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের নির্ধারণ সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই সত্যেন বোস তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারটি করেন। এই আবিষ্কারটির তাৎপর্য পরিষ্কার ভাবে

*46 সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-700026

** A. Pais, "Einstein on Particles, Fields and Quantum Theory" in "Some Strangenes in the Proportion", edited by H. Woolf Addison Wesly Publishing Company, Inc. 1980.

বুঝতে গেলে প্রথমেই বোল্‌ৎজ্‌ম্যান (Boltzmann) সংখ্যায়ন সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার।

মনে করা যাক দুটি বল ও দুটি বাক্স আছে। এই বাক্স দুটিকে শক্তির দুটি স্তর ভাবা যেতে পারে। এদের নাম দেওয়া যাক E_1 ও E_2। বল দুটি সব দিক দিয়ে হুবহু একরকম, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইংরেজীতে আমরা বলতে পারি এরা আইডেন্টিকাল (identical)। প্রশ্ন হল এই রকম দুটি আইডেন্টিকাল বলকে দুটি বাক্সের মধ্যে কতরকম ভাবে সাজান যেতে পারে। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে উত্তর হবে চার। কারণ দুটি বলকেই E_1 বাক্সে অথবা দুটিকেই E_2 বাক্সে রাখা যেতে পারে, আবার একনম্বর বলটিকে E_1 বাক্সে ও দু-নম্বর বলটিকে E_2 বাক্সে অথবা দু-নম্বরটিকে E_1 বাক্সে ও একনম্বরটিকে E_2 বাক্সে রাখা যেতে পারে। যেহেতু এই চারটি বিন্যাসেরই (arrangement) সম্ভাবনা (probability) সমান, এদের প্রত্যেকটির সম্ভাবনা দাঁড়াচ্ছে $\frac{1}{4}$। এই ধরনের যে গণনাপদ্ধতি, একেই বোল্‌ৎজ্‌ম্যান সংখ্যায়ন বলা হয়।

এখন মনে করা যাক E_1 বাক্সে এক নম্বর বল রাখা হয়েছে ও E_2 বাক্সটিতে দু নম্বর। আমি চোখ বুজলাম ও আমার অজ্ঞাতে অন্য কেউ একনম্বর বলটিকে তুলে E_2 বাক্সে ও দু-নম্বর বলটিকে E_1 বাক্সে বদল করে দিলেন। চোখ খুলে আমি কি সেটা ধরতে পারব? বল দুটি যেহেতু আইডেন্টিকাল, নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে—এই দুটি বিন্যাসকে (arrangement) কি ভিন্ন ভিন্ন বলে ধরতে হবে না কি একটি বলেই ধরতে হবে? একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, অন্ততঃ বল দুটির বেলায় (ও আমাদের চারপাশে সাধারণত যে সমস্ত বস্তু আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তাদের সকলের বেলায়ই) এদেরকে দুটি ভিন্ন বিন্যাস বলে ধরাটাই সমীচীন, কারণ বল দুটি আইডেন্টিকাল হলেও তাদের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাদের ওপর একনাগাড়ে নজর রাখা হচ্ছে কি না, তার ওপর সেই স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই নির্ভরশীল হতে পারে না। অর্থাৎ বল দুটি আইডেন্টিকাল হলেও স্বতন্ত্র (distinguishable)। এদের আলাদা আলাদা করে চিনে রাখা সম্ভব। কার্যত না হলেও অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়ে (in principle)।

এবার কল্পনা করা যাক অদ্ভুত এক ধরণের বল যারা শুধু আইডেন্টিকালই নয়, যাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, অর্থাৎ যারা indistinguishable, যাদের আলাদা আলাদা করে চিনে রাখা সম্ভবই নয়। এমন দুটি বলকে E_1 ও E_2 বাক্স দুটিতে কতরকম ভাবে রাখা যেতে পারে? এবার উত্তর হবে তিন—কারণ আগের মতন দুটি বলকেই E_1 বাক্সে অথবা দুটিকেই E_2 বাক্সে রাখা যেতে পারে, কিন্তু এবার E_1 বাক্সে যে কোন একটি এবং E_2 বাক্সে অন্য বলটি রাখলেই চলবে, কোন্ বাক্সে কোন্‌টি আছে তা জানবার আর কোন উপায় থাকবে না। এবার তাহলে এই তিনটি বিন্যাসের সম্ভাবনা হবে $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ নয়। এই যে নতুন ধরনের গণনা পদ্ধতি, একেই বোস সংখ্যায়ন বলা হয়।

সত্যেন বোস 1924 খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাকালীন এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখলেন যে, ফোটন গ্যাসের বেলায় এই নতুন গণনা পদ্ধতিটি ব্যবহার করলে তবেই প্ল্যাঙ্কের সূত্রটি পাওয়া যায়। ইংরেজীতে লেখা তাঁর গবেষণাপত্রটি তখন তিনি আইনস্টাইনকে পাঠান ও প্রসিদ্ধ জার্মান পত্রিকা Zeitschrift für Physik-এ যাতে সেটা প্রকাশিত হয় তার জন্যে অনুরোধ করেন। প্রবন্ধটি পড়ে আইনস্টাইন নিজেই সেটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে Zeitschrift für Physik-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন ও একটি পাদটীকা জুড়ে দেন। তিনি লেখেন "বোস প্ল্যাঙ্কের সূত্রর যে নির্ধারণটি দিয়েছেন, আমি মনে করি সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে পদ্ধতিটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে যে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্বও পাওয়া যায় তা আমি অন্যত্র বিশদভাবে দেখাব।"

এই যুগান্তকারী গবেষণাপত্রটিতে তিনটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রবন্ধটিতে এদের কোনটিরই সুস্পষ্ট উল্লেখ বা আলোচনা পাওয়া যায় না, অথচ এগুলিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এগুলি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথমত, আলোক-কণিকা বা ফোটনগুলিকে সাধারণ বস্তুকণার মত ভাবা হয় নি, ধরে নেওয়া হয়েছে এদের স্বাতন্ত্র্য নেই, এরা indistinguishable। অর্থাৎ এদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান বা গতিপথ নেই, এদের ওপর একনাগাড়ে নজর রেখে চিনে রাখা সম্ভব নয়। এ যেন প্রায় হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি'। দ্বিতীয়ত, ধরা হয়েছে ফোটনদের মোট সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে না, এদের ক্রমাগত সৃষ্টি ও বিনাশ চলতে পারে। তৃতীয়ত, সাধারণ বস্তুকণাদের মত এদের সংখ্যায়নিক স্বাধীনতা (statistical independence) নেই, অর্থাৎ কণিকাগুলিকে পরস্পর স্বাধীনভাবে বাক্সের মধ্যে (বা বিভিন্ন শক্তিস্তরের মধ্যে) সাজান সম্ভব নয়। বরঞ্চ বাক্সগুলিকেই সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বল ও বাক্সের ভূমিকা অদল-বদল করা হয়েছে ও বলের বদলের বাক্সগুলির জন্য বোলৎজ্‌ম্যান সংখ্যায়ন ব্যবহার করা হয়েছে। ফলত ফোটন-গুলির মধ্যে এক রহস্যজনক পারস্পর্য (correlation) এসে গেছে। এই তিনটি ধারণার কোনটিকেই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি বা সাবেকী বলবিদ্যার ধ্যানধারণা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। অথচ এর প্রত্যেকটিরই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (quantum mechanics) আবিষ্কারের পর 1926 খৃস্টাব্দে ও পরে।

বোস সংখ্যায়ন যে শুধু আলোক-কণিকাদের জন্যই প্রযোজ্য

নয়, অন্যান্য নানান রকম বস্তুকণাদের জন্যও প্রযোজ্য, সেটি উপলব্ধি করার কৃতিত্ব আইনস্টাইনের। এর জন্যে তাঁকে সত্যেন বোসের পদ্ধতিটিকে সামান্য একটু বিস্তৃত বা প্রসারিত করে নিতে হয়েছিল। বস্তুকণাদের মোট সংখ্যা যে নির্ধারিত, এই শর্তটি লাগিয়ে তিনি এক অভিনব ফল পেলেন—তিনি দেখলেন যে, চরম উষ্ণতা শূন্যের কাছাকাছি এলে ($\simeq -273°C$) এই আদর্শ বোস গ্যাসের অধিকাংশ কণাগুলির ভরবেগ শূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন (Bose-Einstein condensation) বলা হয়। পরবর্তীকালে তরল হিলিয়াম 4-এর অতিতরলতা (superfluidity) ও কিছু কিছু ধাতুর অতিপরিবাহিতা (superconductivity) আবিষ্কারের পর এই ঘনীভবনের চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সমস্ত ফলাফলের ব্যাখ্যা একমাত্র বোস সংখ্যায়ন দিয়েই সম্ভব। সাবেকী চিন্তাধারা দিয়ে এগুলিকে বোঝা যায় না।

মৌলকণাদের জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যে অবিরাম লীলা ঘটে চলেছে, তার মর্মোদ্ঘাটনেও বোস সংখ্যায়ন অপরিহার্য। জানা গেছে মৌলকণাগুলি কেবলমাত্র দু'রকম হতে পারে। এক ধরনের মৌলকণা বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে, অন্যগুলি একটি বিকল্প সংখ্যায়ন মেনে চলে, যাকে ফের্মি (Fermi) সংখ্যায়ন বলা হয়। যেগুলি বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে, সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'বোসন', অন্যগুলি 'ফের্মিয়ন'। আলোক-কণিকা ও বিভিন্ন ধরনের মেসনগুলি (π, K, δ, $W^{\pm}$, Z° ইত্যাদি) সব বোসন; প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, নিউট্রিনো, Ω^{-}, কোয়ার্ক ইত্যাদিরা ফের্মিয়ন।

1924 খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে অসাধারণ আবিষ্কারটি করে সত্যেন বোস যে অন্তর্দৃষ্টির, পারদর্শিতার, সাহসিকতার ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না।

"বিজ্ঞানের কথা বাংলায় প্রচার করার জন্য প্রায় অর্ধজীবন কাটিয়ে এসেছি। আমি সব সময় মনে করি যে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না তাঁদের চেষ্টা চাই, যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং সেইমত একটা ভাষা সৃষ্টি করা তাঁদের দায়িত্ব। আমরা সবে এই কাজে নেমেছি। কাজেই বাচনরীতিতে শুধু ইংরেজী পত্রিকার অনুসরণ করলেই চলবে না, অবশ্য এদেশে বিজ্ঞান পত্রিকা শুধু নিজস্ব নূতন কথা দিয়ে ভরা যাবে না। যা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন অথচ বিজ্ঞানীর বাজারে মৌলিক বলে চালানো যাবে না, এমন সব প্রসঙ্গেরও অবতারণা করতে হবেই। সেখানে নতুন কথা-চয়ন "গবেষণা"র লেখকরা খুশীমত করতে পারেন। অবশ্য এখানেও বিজ্ঞানের ভাষা ও পরিভাষার কথা উঠবে। এসব ক্ষেত্রে হয়ত অনেকদিন পর্যন্ত নতুন কথা সৃষ্টির চেষ্টা করার থেকে সরাসরি বিদেশী চালু কথাগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞানীকে বাংলাভাষায় আলোচনা করতে নামতে হবে। হয়ত এই ভাবেই আমরা বিজ্ঞানের প্রচার কাজে অনেক তাড়াতাড়ি ফল পেতে পারব। যে ভাষা সতেজ এবং প্রাণবন্ত সেই ভাষা অন্য ভাষা থেকে নতুন কথা আহরণ করতে ইতস্ততঃ করে না। এখানে জাত যাবার ভয় নেই। এভাবে বহুশত শব্দ বিদেশী ভাষা থেকে আমরা সংগ্রহ করে প্রতিদিন ব্যবহার করছি। কাজেই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বিবর্তনের আলোচনা করতে আরও কয়েকশত নতুন কথার আমদানী করলে ক্ষতি কি? নতুন কথা অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টাকে আমি কিন্তু এই বলে বিরোধিতা করছি না। সব রকমের চেষ্টা চলতে থাকুক। ভবিষ্যতে বাঙ্গালী বুঝবে, স্বদেশী কি বিদেশী কথা তাদের ধাতে মানানসই হলো কিনা?"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বনস্পতির ছায়া

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের 90 তম জন্মবর্ষে তাঁর মহত্তম আবিষ্কারের 60 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে—আজও তাঁর সেই অক্ষয় অবদানের দীপ্তি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। বিজ্ঞানীরা অনেকরকম জল্পনা-কল্পনা করেন আচার্য বোস ঠিক একই রকম উঁচুদরের কাজ পরে কেন করেন নি। অবশ্য আইনস্টাইনের কাছে পাঠানো তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রও ছিল যথার্থ উন্নত মানের এবং আইনস্টাইন সেটি Zeitschrift for physik-এ ছাপার ব্যবস্থা করে তাতে নিজের কিছু বিরূপ মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতে সত্যেন্দ্রনাথ এ নিয়ে যথাযথ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনায় কেউ তাঁদের নিজের মতামত থেকে একটুও নড়েন নি। আচার্য বোসের ধারণা ছিল এই কাজটির মূল্যায়ন ভবিষ্যতের কোন যোগ্য বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই করবেন। তাছাড়া প্রায় চল্লিশ বছর আগে আইনস্টাইনের একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে গাণিতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, তা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তবু 'প্ল্যাঙ্কের সূত্র ও আলোর কণাতত্ত্ব' তাঁর গবেষণার অনন্য অবদান—যার মূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

এই গবেষণার পটভূমি হল কৃষ্ণদেহ বিকিরণে নির্গত বর্ণালীর বিশ্লেষণ। উনিশ শতকের শেষভাগে এই বর্ণালীর কম্পাংকগুলি মেপে তাদের শক্তির সঙ্গে তুলনা করে যে বর্ণালী বণ্টন চিত্র পাওয়া যাচ্ছিল, তা পুরাতন কোন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। 1900 খৃস্টাব্দে প্ল্যাঙ্ক একটি সূত্র আবিষ্কার করেন যাতে বিকিরণের শক্তির সঙ্গে তার কম্পাঙ্কের অনুপাত পাওয়া গেল আর এই অনুপাতের ধ্রুবক h প্ল্যাঙ্কের নামে পরিচিত। আইনস্টাইন আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বের $h\nu$-র কোয়ান্টা রূপটি তুলে ধরলেন। বোর পরমাণু বিজ্ঞানে h ব্যবহার করে সুষ্ঠু পরমাণু তত্ত্ব গড়ে তুললেন। কিন্তু এসব কাজে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সঙ্গে সনাতন তড়িৎ বলবিদ্যার সাহায্য নিতে হচ্ছিল। এমন কি লেসার মেসার-এর ইঙ্গিতবহ আইনস্টাইনের উত্তেজিত বিকিরণ সংক্রান্ত বিখ্যাত গবেষণায় প্ল্যাঙ্কের সূত্র পাওয়া গেলেও সেখানে সনাতনী পদার্থতত্ত্বের যুক্তি বাদদেওয়া সম্ভব হয় নি। পউলির গবেষণাপত্রেও এই ত্রুটি এড়ানো যায় নি।

আচার্য বোস তাঁর গবেষণাপত্রে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন—এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। উত্তপ্ত কৃষ্ণদেহ বিকিরণের কোয়ান্টা ফোটন গ্যাস হিসেবে ধরে নিয়ে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সাহায্যে তিনি যে বণ্টন সূত্র পেয়েছিলেন তা প্ল্যাঙ্কের বণ্টন সূত্রের সঙ্গে মিলে যায়। আচার্য বোস একসঙ্গে ফোটনগুলি একই রকমের ধরে তাদের বিভিন্ন শক্তি অবস্থার সম্ভাবনা নিরূপণ করেছিলেন, (পূর্বের গণনা প্রথায় প্রত্যেক ফোটনকে পৃথক সত্তা হিসাবে ধরা হত তাই হিসাব মিলত না)।

আইনস্টাইন বোসের যুক্তির সঙ্গে একমত হয়ে বোসের পদ্ধতিতে গ্যাসের বণ্টনসূত্র আবিষ্কার করেন, যা বোস আইনস্টাইন বণ্টন সূত্র বলে অভিহিত হয়। উচ্চতর উষ্ণতায় ও নিম্নতর ঘনত্বের সীমানায় গ্যাসের ক্ষেত্রে এই সূত্র ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান বণ্টনসূত্রে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। এই সনাতন বণ্টনসূত্র থেকে বোস পদ্ধতিতে কেন পৃথক ফল পাওয়া যায় আইনস্টাইন সে নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি। পরবর্তীকালে স্রোডিংগারের গবেষণায় বোসের এই পদ্ধতির সার্থকতা কোথায় তা প্রমাণিত হয়েছিল। স্রোডিংগার দেখিয়েছিলেন যে সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যায় লব্ধ বিভিন্ন অবস্থার সনাতন সম্ভাবনাতত্ত্বে পৃথক পৃথক কণার বেলায় (যেমন বোসের ফোটন অথবা আইনস্টাইনের গ্যাস পরমাণু) অভিন্ন (indistinguishable) কণা মনে করা যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ দুটি মুদ্রার টসের ফলাফল মুদ্রা দুটি ভিন্ন হলে অভিন্ন দুটি মুদ্রা থেকে দু-গুণ হবে—ফোটনের বেলায় বোস এই অভিন্ন কণার ধারণা প্রথম বলেছিলেন। আইনস্টাইনের উত্তেজিত বিকিরণের তত্ত্বও এই ধারণা দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করা গেল।

1925 খৃস্টাব্দে পউলি পরমাণুর ইলেকট্রনের বেলায় বর্জননীতি (exclusion principle) আবিষ্কার করেন। ইলেকট্রন-এর ক্ষেত্রে বোস সংখ্যায়ন প্রযুক্ত হতে পারে না। তবে ইলেকট্রন সমষ্টিকে গ্যাস ধরে নিয়ে বোসের পদ্ধতিতে ফের্মি ও ডিরাক আর একটি যে বণ্টন সূত্র পান তাকে ফের্মি-ডিরাক বণ্টন সূত্র বলা হয়। উচ্চতর উষ্ণতা ও নিম্নতর ঘনত্বে এই বণ্টন সূত্রও ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান বণ্টন সূত্রে পরিণত হয়। এই সনাতন সূত্র থেকে নিম্নতর উষ্ণতায় ও উচ্চতর ঘনত্বে যে পার্থক্য দেখা যায় তা থেকে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও কঠিন বস্তুর পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ সহজেই করা যেতে পারে।

আজ পর্যন্ত যত মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে তারা হয় বোস আইনস্টাইন অথবা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে। বোস সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে ফোটনের মত এরকম কণাদের বোসন নামকরণ করেন ডিরাক—আর অন্যদের বলা হয় ফের্মিয়ন।

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

$h/2\pi$ এককে যে কণার স্পিন দুগুণ করলে জোড় সংখ্যা হয় তারাই বোসন আর যাদের দ্বি-গুণ স্পিন বিজোড় সংখ্যা তারা ফের্মিয়ন। বোসের পদ্ধতিতে গ্যাস পরমাণুর বণ্টন সূত্র দিয়ে আইনস্টাইন এনট্রপির ধ্রুবক পেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিম্নউষ্ণতায় বোস-আইনস্টাইন গ্যাসে যে অস্বাভাবিক ধর্মের আভাস পাওয়া যায় তা দিয়ে তরল হিলিয়ামে সন্ধি-উষ্ণতার নীচে ঘর্ষণহীন স্রোত অর্থাৎ অতিবহমানতা ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় এ কথা বলেছিলেন এফ. লণ্ডন। বাস্তবে ল্যাণ্ডাউ, বগুলিবভ ফেইনম্যান তাঁদের হিলিয়াম তত্ত্বে এর যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন।

বোস সংখ্যায়নের আর একটি প্রয়োগ হল নিম্নউষ্ণতায় ধাতুর অতিপরিবাহিতা ধর্ম ব্যাখ্যায়। তত্ত্বগত নীচুতাপ মাত্রায় ইলেকট্রনগুলি যে 'কুপার জুড়ি' বাঁধা অবস্থায় থাকে তাদের সাহায্যে বোস আইনস্টাইন ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় ধাতুর অতিপরিবাহিতা ধর্মের সৃষ্টি হয়, হিলিয়ামের অতিবহমান ধর্মের মত। এই শতকে বোসের গবেষণার এই বিস্ময়কর দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যাবে যে গত ষাট বছরে বোস পদ্ধতির কী রকম বহুল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। গ্যাসের বণ্টন সূত্র নির্ধারণে আইনস্টাইন গণনায় বণ্টনের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি (fluctuation) লক্ষ্য করেছিলেন—তাতে তাঁর মনে হয়েছিল পরমাণু সমষ্টির বুঝি তরঙ্গের মত কিছু দোলন আছে। স্রোডিংগার তরঙ্গ-বলবিদ্যায় এই ধারণাটুকু স্পষ্টতই কাজে লাগিয়েছেন।

বোস পদ্ধতির এইসব প্রয়োগ ছাড়াও নূতন নূতন মৌলিক কণার আবিষ্কারে বোসন অভিজ্ঞা বোসের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক যে চারটি বল নিয়ে এই বিশ্ব তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিনিময় কণা—বোসন। মহাকর্ষ বলের বিনিময় কণা গ্র্যাভিটন এখনও অনাবিষ্কৃত। নিউক্লীয় তীব্র বলের বিনিময় কণা পাইবোসন ও ক্ষীণবলের $W^{\pm}$ ও Z° বোসনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। পাইবোসনের তত্ত্ব দেন হিদেকী য়ুকাওয়া, ক্ষীণবলের বোসনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন সালাম-ভিনবার্গ। তড়িচ্চুম্বকীয় বলের বিনিময় কণা ফোটনের তত্ত্ব থেকেই তো বোসন নামকরণ হয়েছে। এই সব তত্ত্ব থেকে তড়িচ্চুম্বকীয়, তীব্র ও ক্ষীণ বল একীকৃত করা সম্ভব হয়েছে। মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল নিয়ে যে একীকৃত তত্ত্ব আইনস্টাইন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, বোসের ঐ তত্ত্ব গবেষণায় যা ধরা পড়ে নি সেই একীকৃত তত্ত্ব আজও অমীমাংসিত। সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীর আগেই হয়ত মহাকর্ষের বিনিময় বোসন কণা গ্র্যাভিটন ধরা পড়বে, তখন হয়ত চারটি বলই একীকৃত হয়ে এক অদ্বয় বলের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানের এই সব আধুনিক অগ্রগতির ভেতর দিয়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর আবিষ্কারের জন্য অমর হয়ে থাকবেন।

1974 খৃস্টাব্দে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে শোক প্রস্তাব নিয়েছিলেন তাতে আচার্যকে বৃহদারণ্য বনস্পতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছিল। আজ থেকে ষাট বছর আগে সেই বনস্পতির বিকাশ হয়েছিল এবং আজ তা বৃহৎ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। অমর সেই বনস্পতির ছায়া বিজ্ঞানের জগতে আজও ক্রমপরিব্যাপ্ত।

জাতীয় জীবনে কৃষি ও শিল্পের প্রতিযোগিতার কথা যে ভাবে আমরা সচরাচর ভাবতে বসি তা মূলতঃ ভ্রমাত্মক। দুইই মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ইংলণ্ডে এখন একটি রব উঠেছে—'মাটির দিকে ফিরে চল'—এটা আমি স্বাস্থ্যকর ভঙ্গী বলে মনে করি। চীনের মত ভারতবর্ষে কৃষি চিরকাল লোকের বুনিয়াদী ও প্রধান পেশা হয়ে থাকবে। আমি মনে করি কৃষি ও শিল্পে প্রচেষ্টার অনুপাত এদেশে 3 : 1 এই হারে হওয়া উচিত। কৃষিকে করে তুলতে হবে আরও উন্নত ধরণের ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। সৌর ও বৈদ্যুতিক শক্তির আরও বেশী ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। উৎপাদনের হার এইভাবে উচ্চাঙ্গের করে তুলে, এর বিপক্ষে যে অর্থনীতিমূলক আপত্তি তুলে বলা হয় বার বার কৃষি প্রচেষ্টার ফলে জমি থেকে ক্রমশঃ উৎপাদনের ও মুনাফার হার কমে যাবে—এটাকে খণ্ডন করতে হবে। সচরাচর বলা হয় শিল্পের তুলনায় কৃষির বিপক্ষে এইটি প্রধান কথা। এইভাবে ভারতে কৃষি প্রবর্তন করলে ও যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষের যে প্রকাণ্ড পুঁজি—তার লোকসংখ্যা ও তার বিস্তৃত ভূসম্পদ—তার সম্যক ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লাইনে স্থান বজায় রাখতে পারবো।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

মাতৃভাষা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আমি প্রায় সারা জীবন শিক্ষা নিয়ে কাটিয়েছি। যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল যে, যে-বিজ্ঞানের চর্চা করে প্রতীচ্য এত উন্নতি করছে, আমাদের দেশে সেটা শীঘ্র চালু হবে, এবং আমরা জীবন উৎসর্গ করবো সে সব জিনিস দেশের মধ্যে আনতে।

প্রায় ষাট বছর আগে যখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন দেশের মনীষী এবং যাঁরা দেশকে ভালবাসেন সেই সব নায়করা মনে করেছিলেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অন্তত বাংলাদেশের মধ্যে স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। বহু বৎসর চলে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তার অনেক সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অন্য দেশে গেলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। সব দেশেই চেষ্টা চলছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, যে ভাষা সবাই বোঝে তার উপর বনিয়াদ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবার। সব জায়গায় এই রীতি চালু রয়েছে। মধ্যযুগে অবশ্য অন্য ভাষা অবলম্বন করে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল; জ্ঞানী-গুণী লোকরাই তার সুযোগ পেতেন। এর অসুবিধা ছিল এই যে, সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না। তার জন্য অন্য লোকের দরকার হত। তারা যেমন বুঝত সেই রকম সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিত।

এইভাবে কিন্তু দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার বড্ড আস্তে আস্তে হত। আজকের যুগে একদিকে যেমন লোকে চেষ্টা করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে দেশকে বড় করতে, মানুষকে নানারকম সুখ-সুবিধা দিতে,—তেমনি আবার এটাও বুঝেছে যে কেবল একটা শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান যদি আবদ্ধ থাকে তাহলে উন্নতি তত দ্রুত হয় না। কাজেই আজ যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তখন আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে কি করে দেশের ভিতর তাড়াতাড়ি শিক্ষার বিস্তার হবে। যদি চেষ্টা করা যায় তবে এ-দেশের মধ্যে থেকে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দূর করা যেতে পারে—এটা যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁরাই জানেন।

আমার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সে অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে আপনাদের বলব।

প্রায় এক-শ' বছর হল পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে সে জ্ঞান ও সে-সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। এখনও এক-শ' বছর হয় নি। এরই মধ্যে জাপানের কীর্তিকলাপের কথা সকলেই জানেন। বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না, আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এ রকম কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—এত অল্প সময়ে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমান এই অতি সম্পদের মধ্যে কি করে জাপান আবার উঠে দাঁড়াল। শিক্ষা ও উন্নতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমি তাই চেষ্টা করেছিলাম জানতে যে, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কি রকম ভাবে হয়েছে। জাপানে কম করে নয় বৎসর শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রায় সকলেরই স্কুলে পাঠানো হয়। প্রায় সকলেরই স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। এর জন্য কারুর পয়সা লাগে না। নীচের দিকে খরচ যোগায় দেশের মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা আমাদের দেশের মতোই জেলা অথবা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তারাই খরচার বেশীর ভাগ দিয়ে থাকে। শিল্পকলা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, সেগুলির ভার নিয়েছেন সরকার। তাছাড়া উপরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশির ভাগ সরকারী পয়সায় চলছে।

আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়ত কোনও একটা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করে জাপানে বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল। আমি অনেক বই যোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশই জাপানীতে লেখা। তাই পাঠোদ্ধার হয় নি। অবশ্য দু-চারখানা ইংরেজী বইও তার সঙ্গে পেয়েছি।

একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন জাপানীরা। সেখানে শিক্ষিত লোকেরা—যাঁরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষক, তাঁরা সকলে একত্র হয়েছিলেন আলোচনা করতে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কি করা উচিত এবং মানুষের ভবিষ্যতই বা কি হবে। সম্মেলনে আমি এবং আরও দু' একজন বিদেশী ছিলেন কিন্তু বেশীর ভাগই জাপানের লোক এবং আলোচনা যা হয়েছিল তা সমস্তই জাপানীতে। তাঁদের দু'-একজন ইংরেজী ভাষাতে কিছু কথা বললেও পরে আলোচনা যা হল সবই জাপানী ভাষায়। এটা বললে ভুল হবে যে, তাঁরা ইংরেজী জানেন না। কেননা, আমরা যখন ইংরেজী বলি তখন তাঁরা প্রায় সকলেই বোঝেন। তবে তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজী বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেই জন্য যে সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানী ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। দেখা গেল শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের কথা সবই জাপানী ভাষায় বলা সম্ভব এবং জাপানী কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র।

আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতকগুলি অসুবিধা আছে। যাঁরা একটু খবর রাখেন তাঁরাই তা জানেন। একটা অসুবিধা হল এই যে, আমাদের যেমন অল্পসংখ্যক অক্ষর দ্বারাই সব বাক্য লেখাও যায়, বইতেও

ছাপানো যায়, জাপানী ভাষাতে সে ব্যবস্থা নেই। আছে নিজেদের অক্ষর এবং চৈনিক অক্ষর প্রায় হাজার তিনেক। যাঁরা উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক তাঁদের এ সবকটাকেই শিখতে হয়। এর জন্য আমাদের দেশে যেখানে মাতৃভাষা বছরখানেক বা বছর দু'য়েকের মধ্যে চলনসই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, ছেলে-মেয়েদের সেখানে জাপানী ভাষা শিখতে গড়ে লাগে প্রায় ছয় বছর। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এমন অবস্থা জাপানী ভাষার যে প্রত্যেক জাপানী বিজ্ঞানী, জাপানী দার্শনিক নিজেদের মনের প্রত্যেকটি কথা জাপানীতে প্রকাশ করতে পারেন। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে, দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়েছিল তখন তার জন্য শিক্ষক পাবার কোনও অসুবিধা হয়নি,—এমন শিক্ষক যিনি জাপানী ভাষায় বিজ্ঞান কিংবা দর্শন কিংবা অন্যান্য কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছেন ও পড়াতে পারেন।

এইজন্য জাপানে তাড়াতাড়ি শিক্ষা বিস্তার হয়েছে। ফলে জাপান অতি সহজেই সমস্ত জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছে। যদি আমরা জাপানী ও জার্মান জাত দুটিকে দেখি—পৃথিবীতে যে দুটি জাত তাড়াতাড়ি জ্ঞানের স্বল্পাবস্থা থেকে আজ একেবারে শীর্ষস্থানে চলে গিয়েছে—তাদের উভয়ের মধ্যে শিক্ষিত অথবা অক্ষর পরিচয় আছে এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়ের উপরে।

এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে, এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে। আমাদের দেশে অনেক ভাষা আছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষায়—বিশেষ করে যেগুলি সংবিধানে গণ্য হয়েছে, মুখ্য ভাষা বলে—শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বমোট জাপানীদের কিছু কম বা বেশী।

আমার মনে হয় যে প্রথমেই আমরা সারা দেশের কথা না ভেবে যদি আমাদের নিজেদের ঘর তৈরি করি, অর্থাৎ আমরা যে প্রদেশে থাকি সেই প্রদেশের লোকের শিক্ষা এমন ভাবেই বন্দোবস্ত করি যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর কাছে পৌঁছায়, তাহলে আমাদের সামনে নতুন যে সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজেই চলে যায়।

আজকের দিনে পৃথিবীতে একথা চলেছে যে, মানবজাতি একত্র হয়ে একটা মহামানব সমাজ গড়ে তুলবে। কিন্তু এটা কেউ ভাবেন না যে, তার জন্য নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বিশেষ কোন ভাষায় চালাতে হবে। কারণ মনে যদি থাকে ভালবাসা, তাহলে ভাষার অসুবিধা থাকলেও মানসিক যে মিল সেটা রাখতে অসুবিধা হয় না।

অনেক সময় এই কথাটাই বলা হয় যে, ইংরেজী ভাষা না হলে আমাদের দেশে একতা থাকবে না। বলা হয়, আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে একত্র বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদের মনে ছিল যে, আমরা এক‌ই জাতি। অতএব বর্তমানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই সেই যোগসূত্র বজায় রাখা হোক। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে, ওই শৃঙ্খল পরবার আগে আমাদের জাতীয়তা বোধ ছিল না।

আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানে আছেন দেশের ঐক্য তাঁরা নিজেদের মনের মধ্যে ততটা হয়ত অনুভব করেন না। আমাদের নেতারা সব সময় অবহিত নন যে সত্যিই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্র কত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যখন বিদেশে গিয়ে একত্র হন তখন তাঁদের চোখে ঠেকে তাঁদের মনের গঠন এবং আচার-ব্যবহার কত এক অথচ বিদেশী থেকে কত তফাৎ। সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, প্রাদেশিক ভাষায় নিজ নিজ প্রদেশে যদি শিক্ষা শতকরা পুরোপুরি চালানো যায় তাহলে দেশের ঐক্য ভেঙ্গে যাবে না।

দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে যেমন অনেক গৌরবময় কথা আছে, তেমনি অনেক কলঙ্কের কথাও আছে। এই কলঙ্কের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যাঁদের সূত্রে এই কলঙ্ক ছড়িয়েছে তাঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত। আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের যেমন গর্ব করবার অনেক কথা আছে তেমনি আমাদের দুঃখ করবার, লজ্জিত হবার কথাও আছে। কিন্তু সেই সকলের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে অনেক সময় দেখা যাবে ইংরেজী শিক্ষিত, গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ।

অতএব আমার মনে হয়, ইংরেজী যে দেশের ঐক্যের কারণ তা নয়। একতার কারণ আমাদের নিজেদের মনের মিল। আমরা যদি দরদী হই তাহলে বিদেশী ভাষাভাষীদেরও আমরা আপন করে নিতে পারি, অপর পক্ষে আমাদের মনের মধ্যে যদি ভ্রাতৃবোধ না থাকে তাহলে পাকিস্তান হতে বেশী দেরী হয় না। আর এই দুই দেশ যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা দু-জন একই প্রদেশবাসী, এবং দু-জনেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরেজী ভাষার দ্বারা বহুদিন চেষ্টা করলেও আমাদের দেশে জনজাগরণ হয় নি। তারপর আমাদের জাতীয়তার পিতা যখন দেশের কাছে এসে দাঁড়ালেন—যদিও তিনি ইংরেজী অনেকের থেকে ভালো বলতে ও লিখতে পারতেন—তিনি চেয়েছিলেন এমন ভাষায় কথা বলতে যা সকলেই বুঝতে পারে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিতের আয়ত্তের মধ্যে না থাকে, সেগুলি যেন দেশের সকল লোকের কাছে পৌঁছে যায়।

যাঁরা বলেন, ইংরেজী যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানলা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্যে

দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে, চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে যেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেই রকম নীচের অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া সকলের দারিদ্র অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকালের জন্য চাপানো উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া। আমরা পনেরো বছরেও এ কাজে বিশেষ এগোতে পারি নি।

তাই আমার মনে হয় আজকে যে আপনারা বলছেন, ইংরেজী যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে সেখান থেকে তাকে হঠানো হোক—এই কথাটা ভাল করে বিচার করে দেখুন। ভেবে দেখুন বিভিন্ন প্রদেশে কিভাবে এটা কার্যে পরিণত করা যায়। আমি এই হঠানোর জন্য যা বলেছি সেটা শুধু আমাদের আত্মরক্ষার তাগিদেই। কেননা, আমি মনে করি যে ইংরেজীর উপর এত বেশী জোর দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারা জীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কি করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।

আমাদের দাবী হল শিক্ষিতের উপর। তাঁরা চেষ্টা করুন দেশে নতুন যুগ যাতে আসে। শিক্ষার নতুন বাহন তাঁরা স্থির করুন। প্রদেশে প্রদেশে এমন ধরনের ব্যবস্থা চালু করুন যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ থেকে অশিক্ষা অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই সূত্রে ভাবোন্মাদীদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে, শুধু একটা নাম খারিজ করে, একটা নাম কেটে দিয়ে, আর একটা নাম চালালেই আমাদের নতুন যুগের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে না।

আমাদের প্রয়োজন দেশের লোকদের শিক্ষিত করা, যে সমস্ত বস্তু-জ্ঞান তাদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, বিত্তশালী করে, তাদের মুখের খাবার যোগায়,—সেই জ্ঞান দেশের সর্বত্র স্বল্প আয়াসেই যেন পাওয়া যায়, এটাই আমি চাই।

এর জন্য বহুদিন চেষ্টা করতে হবে। শুধু একত্র হয়ে আলোচনা করলেই কাজ শেষ হবে না। আমার আশা আপনাদের এই সম্মেলন থেকে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীরা দেশে গিয়ে এই কথাটা মনে রাখবেন। এই সম্মেলন সার্থক হবে যদি আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দুটি কথা উপলব্ধি করতে পারি। সে দুটি কথা এই ঃ এক, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে; দুই, আমাদের আঞ্চলিক প্রেম ভাষার উপর নির্ভর করে না, সেটা আমাদের মনের কথা। এই দুটি কথা যদি আপনারা নিয়ে যান তাহলেই মনে করব আপনাদের আয়োজন সফল হল। পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আরও দুটি বিষয়ে সচেতন হব বলে আশা করি। প্রথমত, আমাদের একতা অনেকটা নীচুতে, কেবলমাত্র ওপরে ওপরে,—এক ভাষা বলছি বলেই একতার বন্ধন আসে নি। দ্বিতীয়ত, এমন কোনও সমস্যা নেই যা সমবেত ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা সমাধান করা যায় না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, জাতির ঐক্যবর্ধন হবে কোনও এক বিশেষ ভাষার পন্থায় নয়। মানুষের মনের মিলের উপর যে, জাতির একতা প্রতিষ্ঠিত একথা বিশদভাবে বলবার প্রয়োজন আছে। আমরা যদি কিছু গড়ে তুলতে চাই তাহলে কর্মীদের মধ্যে পরস্পরের মানসিক মিল থাকা একান্ত দরকার। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমরা যে চেষ্টা করব, সেটা যে ইমারতের অংশবিশেষ, তা বোধ হয় সব সময় একভাবে জুড়বে না।

একটি বিদেশী ভাষা, একটি বিদেশী শাসন, আমরা অনেক দিন সহ্য করেছি। যদি এর দ্বারাই ঐক্যসাধন হোতো, সে ঐক্যসাধন এতদিনে হওয়া উচিত ছিল। তা হয় নি বলেই সংবিধানের স্বীকৃতি ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আজ নানা রকম কথা উঠেছে।

আমাদের দেশের ঐতিহ্য বহু শত বৎসরের সাধনার ফল এবং তা যত পুরানোই হোক না কেন, সে সবই আমরা জীবনের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চাই। ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই জাতার ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। আমি অন্তঃ নিজের মন থেকে অনুভব করেছি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি ঐক্য নাও থেকে থাকে, মনের ঐক্য যে ছিল সেটা নিজের স্বার্থবোধ কিছুটা দমিয়ে রেখে দেশের মধ্যে কেউ ভ্রমণ করলেই বুঝতে পারবেন। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা, আমাদের তীর্থ যাত্রীরা, আমাদের সাধারণ হিন্দু ছেলেমেয়েরা, এমন কি গ্রামের ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যারা এক সঙ্গে থাকেন তাঁরা সকলেই অনুভব করেছেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধন আছে সেটা সহজে ছিন্ন হবার নয়। তবে স্বার্থের সংঘাত কখনও ঐক্যবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঐক্যানুভূতিকে জাগিয়ে রাখা সাধনা বিশেষ। মুখের কথায় ঐক্য হবে না।

এই সাধনার পথ কি? আমার মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিজেদের ভাষার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের ঐতিহ্য কি এবং কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল। পৃথিবীর এই বৈচিত্র্য যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের কাছে দাবী আসে সে একটা নতুন কিছু করুক। তাই আমাদের দেশের ঐক্য আগে যে ভাবে অনুভূত হত তার তুলনায় আজকের দিনে যা আমরা গড়ে তুলব সেটা আরও বিশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন হবে; আরও গভীর, এবং তার মধ্যে শক্তি হবে আরও বেশী। এটা আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের কাছে ডাক এসেছে—এবার নিজেকে চিনতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমস্ত লোককে—আঁকড়ে নিয়ে জানতে শিখুক যে, স্বাধীনতার স্বাদ কি, কি আমরা হারিয়েছিলাম এবং আজকের দিনে কি আমরা পেয়েছি।

আমাদের সেই সব রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, যে রাস্তা অনুসরণ করে অন্যান্য জাতিরা উন্নতির শিখরে উঠেছে। এই রাস্তায় আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এইজন্য দেশের লোকের সকলের মনের মধ্যে বর্তমান যুগের যে প্রধান কথা তা পৌঁছে দিতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনোভাব এখন আর রাখলে চলবে না। মানুষ যে শক্তি অর্জন করেছে প্রকৃতির উপর, তার যে প্রভাব হয়েছে নানা দেশে, সেটা অনুভব করতে হবে শুধু আজকে আমরা যাঁদের শিক্ষাভিমানী বলি তাঁদের নয়, দেশের প্রত্যেককে।

এ না হলে অন্যান্য দেশ যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারব না। আর সত্যি ভারতবর্ষ বলতে যদি আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশেষ ধ্বনি ওঠে, যদি আমাদের প্রাণ কাঁদে স্বদেশবাসীর জন্য, তাহলে একটি বিদেশী ভাষার দরকার হবে না পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য। যে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশী শক্তিকে দেশ থেকে বের করবার জন্য সংগ্রাম করেছিল তারা যখন নিজেরা ক্ষমতা হাতে পেল তখন তাদের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে লাগল।

বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ, মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। কেবল মাত্র রাজকীয় মঞ্চ থেকে একতার কথা বললে চলবে না। আমাদের বলতে হবে প্রত্যেক ঘরের কোণ থেকে এই একতার বাণী। কেবল বললে চলবে না যে, আমরা শিক্ষার বিধান করেছি। সত্যি করে সকলকে মনে করতে হবে যে এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই জন্যই মাতৃভাষার দরকার, সাধনার দরকার এবং মনকে শুদ্ধ করবার দরকার। তাই পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি না করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের আলোচনা করা উচিত।

আপনারা যাঁরা এটা অনুধাবন করেন তাঁরা ধৈর্য ধরে আপনার সীমার মধ্যে কাজ চালিয়ে যান। আমরা ছেলেবেলায় বলতাম, এগিয়ে চল, কেননা উপরে ভগবান আছেন এবং আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আপনাদের মনের মধ্যে যদি একতার ছবি ফুটে ওঠে থাকে তাহলে আপনাদের ভয় করবার কিছু নেই।

আপনারা সকলে মিলে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, আমাদের দেশের লোকেরা জানুক আমাদের উপর কতটা দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যেন অল্প দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি,—যার ফলে প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক যুবক-যুবতী মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আমরা যেন বুঝতে পারি যে, এই বর্তমান যুগে যেখানে আমরা জন্মেছি সেখানে অল্পশিক্ষায় ভীষণ বিপদ আছে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই কারণ, কথা বলে যে, সব সময় আমরা মনকে স্পর্শ করতে পারি তা ঠিক নয়। একজন লেখক বলেছিলেন যে, ভাষার কাজই হচ্ছে লোকের মনের ভাব গোপন রাখা। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে পরস্পরের বিষয়ে যদি মনোযোগ সহকারে ভাবি তাহলে নিজের মন থেকে যে উত্তর নির্ভুল ইঙ্গিত দেয় তা আপনিই খুঁজে পাব। আমি তাই আশা করি যে আপনাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করবে।

[1962 খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত 'আংরেজি হঠাও' সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'রচনা সংকলন' থেকে পুনর্মুদ্রিত]।

"বাহ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত নিত্যসম্পর্ক সমূহকে আমরা গণিতের অপেক্ষাকৃত সরল প্রত্যয় অনুসারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলিকে শুধু ন্যায়পথে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আবিষ্কারের জন্য আমাদের আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে তাহাদের সংযোজনার ফলাফলের সহিত বাহ্য-জগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে, আমরা যথার্থ প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কিনা। শুদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বনে গাণিতিক উপায়ে যে বিজ্ঞানসৌধ আমরা রচনা করি তাহা শুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধশূন্য। তাহাতে দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ না থাকিলেও তাহার সহিত বহির্জগতের নিত্যসম্বন্ধ নাই। সেইদিক হইতে উহা বস্তুসারশূন্য সংযোজনা মাত্র। উহার প্রত্যয়গুলির সহিত বহির্জগতের বস্তুসত্তার যথাযথ সম্পর্ক আরোপ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে ঐ বিজ্ঞান অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কি না।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞান গবেষণা, সৃজনশীলতা ও আচার্য বোস

মহাদেব দত্ত*

প্রগতি ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। এজন্য চাই বিজ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় বিজ্ঞান গবেষণায়। উন্নত ও উন্নতিশীল দেশে বিজ্ঞান গবেষণার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত।

বিজ্ঞান গবেষণা হয় দুই ধারায়—গতানুগতিক ভাবে বিজ্ঞান চর্চায় ও বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের হয় বৃদ্ধি। অধিকাংশ বিজ্ঞান গবেষকই নিয়ত বিজ্ঞানে তথ্য ও তত্ত্বের প্রসার করেন। বিজ্ঞান প্রগতিতে এটি অপরিহার্য। এতে সৃজনশীলতার পরিচয় থাকে তবে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর জন্য প্রয়োজন গবেষক বিজ্ঞানের যে বিষয় গবেষণারত সে বিষয়ে অপরাপর গবেষকেরা বিশেষ যে চিন্তা-ভাবনা করছেন তার সামান্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা। অবশ্য এখানে ঠিকমত বিষয় নির্বাচন করতে পারলে সহজে পরিচিতি বা স্বীকৃতি মেলে ও তার সঙ্গে নানা সুযোগ-সুবিধা—বিদেশ ভ্রমণ, অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতি সহজলভ্য হয়। বিষয় নির্বাচনের সময় দেখা প্রয়োজন যে, সক্রিয় গবেষকদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর তথ্য বা তত্ত্বের উপরিউক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, যা করা হলো তা তাদের সমর্থনযোগ্য।

বিজ্ঞান প্রগতিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আসে; গতানুগতিক গবেষণা দিয়ে নয়। যখন কোন গবেষক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গতানুগতিকতার বাইরে এসে নতুন চিন্তা-ভাবনার দ্বারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন তখনই নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এই সৃজনশীলতা বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে খুবই বিরল। এতে ভয় থাকে যোগ্যবোদ্ধা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে সমস্ত প্রয়াসই স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। এর জন্য চাই স্বাধীন চিন্তাধারা, প্রবল আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, প্রচণ্ড কল্পনাশক্তি, বিজ্ঞানের জ্ঞান তত্ত্বের সঙ্গে গভীর পরিচয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান তত্ত্বের সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকলে কল্পনা বিপথে চালিত হতে পারে। আর কল্পনাশক্তি না থাকলে নতুন কোন চিন্তা-ভাবনা সম্ভব নয়। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে সহজে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রাহ্য না করার জন্য চাই আদর্শবাদ ও আত্মবিশ্বাস। এ ধরণের গবেষণায় সৃজনশীলতা অতীব বিরল, আর এই সৃজনশীল বিজ্ঞানীরা নব নব বিজ্ঞানের স্রষ্টা; গ্যালিলিও, নিউটন, প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, স্রোয়েডিঙ্গার, ডিরাক এবং আচার্য বোস এঁদেরই এক একজন।

আচার্য বোস কোয়াণ্টাম স্টাটিস্টিক্সের জন্মদাতা। তবে যাঁরা গভীরভাবে বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা জানেন, যাঁরা কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের গোড়াপত্তন করেছেন—আচার্য বোস তাঁদেরই একজন। এ বিষয়ে পরিষদ প্রকাশিত 'বোস সংখ্যায়ন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আপেক্ষিকতাবাদে একীভূত তত্ত্বের মূলগত 64 সমীকরণের (যার সমাধান অসাধ্য বলে ভাবা হতো) সম্পূর্ণ সাধারণ সমাধান আচার্য বোস বার করেন এবং এতে এই বিষয়ে স্বভাবতই নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। আচার্য বোসের পরিকল্পিত তাপদীপ্তি (Thermo-Luminescence) মাপার যন্ত্রটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছে। এসব বাদেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আচার্য বোসের বিভিন্ন প্রবন্ধ আছে এবং প্রায় প্রতি প্রবন্ধ সেই বিষয়ে বিশেষ মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখে।

আচার্য বোস বিজ্ঞানালোচনায় অলস ছিলেন ও পরিণত বয়সে বিজ্ঞান গবেষণায় বিরূপ ছিলেন এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনলস ভাবেই বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করেছেন; এ বিষয়ে কলিকাতা গণিত সমিতি (Calcutta Mathematical Society) প্রকাশিত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য। অবশ্য তাঁর বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ফলাফল তাঁর কাছে বিজ্ঞানের বিশেষ মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান মনে না হলে তা প্রকাশের জন্য পত্রিকায় পাঠাতেন না। এখানেই আচার্য বোসের সঙ্গে সাধারণ বিজ্ঞান গবেষকের পার্থক্য। তাঁর মত যুগান্তকারী বিজ্ঞানীর কাছে এটাই স্বাভাবিক।

দুঃখের বিষয় এক নবীন বিজ্ঞান শিক্ষকের মতে আচার্য বোসের "মানসিক গঠন, তাঁর সংবেদনশীলতা, আত্মমগ্নতা, নানান ধরণের 'ইনহিবিশন' এইসব মিলে তখনকার দিনে ইওরোপে উচ্চতম বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক অ্যাপ্রোচ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করল।" আশ্চর্যের কিছু নেই, মানুষ নিজের মাপকাঠিতে অপরের মূল্যায়ন করে। উপরিউক্ত মন্তব্যটি আচার্য বোসের পরিচয় নয়; তা প্রকৃতপক্ষে নবীন বিজ্ঞানীর মনের দর্পণটির (যাতে আচার্য বোসের প্রতিভার প্রতিফলনের চেষ্টা হয়েছে) সম্মুখ পরিচয়।

আচার্য বোসের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা যখন বিজ্ঞানের কোন নতুন শাখার তথ্য বা তত্ত্বের গভীর আগ্রহে বিজ্ঞানচর্চার পঠন-পাঠন করতেন তখন আচার্য বোস সে বিষয়ে নিজেই প্রবল আগ্রহ দেখাতেন ও বিস্তৃত আলোচনা করতে চাইতেন। এ বিষয়ে যখন আলোচনা শুরু হতো তখন কয়েক দিন ধরে ঐ আলোচনাই চলত। আলোচনার সময় দেখা যেত আচার্য বোসের ঐসব নতুন শাখায় মূলগত বিষয়ের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে। নানা বিষয়ে মূলগত ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাদির সঙ্গে নিবিড় হওয়ার শিক্ষা তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কাছ থেকে পেতেন। যেসব বিজ্ঞানী আচার্য বোসের বিজ্ঞানে অবদানের মূল্যায়নে রতী হয়েছেন বা হতে চান তাঁদের আচার্য বোসের বিজ্ঞানের মৌলিক প্রবন্ধগুলি যত্ন সহকারে পাঠ করা উচিত। এ শিক্ষাটি আচার্য

* বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

বোসের নিকট গ্রহণ করতে পারেন (এই প্রবন্ধগুলি পুনঃ মুদ্রিত হয়েছিল এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে পাওয়া যাবে)।

আচার্য বোসকে কেউ কেউ দোষারোপ করেন, কারণ তাঁর একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে যখন মহামতি আইনস্টাইন মতবিরোধ প্রকাশ করলেন তখন আচার্য বোস তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন না। তাঁর সৃজনশীল মানসিকতা তাঁর গভীর সৌজন্যবোধ (যা বিজ্ঞানীরা তাঁর নিকট শিক্ষা নিতে পারেন) তাঁকে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত করে নি, যেটা সাধারণ বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিজ্ঞানের প্রগতি আইনস্টাইন ও আচার্য বোসের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় নি। যদি কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে আইনস্টাইন যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা সবটা বিজ্ঞানস নয়, তবে তাঁর (উক্ত বিজ্ঞানীর) নিজের উচিত এবিষয় বি[illegible]ণ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করা। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তার কয়েকটি প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন, আগ্রহী পাঠকেরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞানে সৃজনশীলতার জন্যেও কল্পনা প্রয়োজন। বিজ্ঞানেও সৃজনমুখী চিন্তা-ভাবনার কোন বাঁধাধরা পথ নেই। বিভিন্ন সৃজনশীল বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চিন্তা-ভাবনা করেন ও নতুন আবিষ্কার করেন। এ বিষয় গণিতবিদ হাদামা-র Psychology of Invention in field of Mathematics পুস্তকটি উল্লেখযোগ্য। তবে গবেষককে বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিধি ও যুক্তিবাদের সঙ্গে সম্মুখ পরিচিত হতে হবে এবং নিজের গবেষণায় পাওয়া নতুন ফল জ্ঞান তত্ত্ব ও যুক্তিবাদসম্মত রূপে প্রকাশ করতে হবে।

"সর্বদেশের মানুষ একইভাবে জীবনযাত্রা চালায় না। শিক্ষায়, কৌশলে কার্যকারিতায় তাদের মধ্যে নানান স্তরভেদ আছে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদ সারা পৃথিবীতে একই ভাবে ছড়ান নেই। জাতির মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা সমস্ত খনিজ সম্পদ নিজেদের দখলে রাখতে উদগ্রীব। যারা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্ত ভাণ্ডারের আজ অধিকারী তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী করতে চায়। অনুন্নত জাতির দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আজও অটুট আছে তার উপর অধিকার বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস। ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সাথে প্রবলের সংঘর্ষ, নির্মম কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত, বহু বৎসরে মানুষের আয়াসের সঞ্চিত ধন অল্পদিনে পরিণত হয় ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপে। সচ্ছলতার দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ মহামারী। বিজয়লক্ষ্মী যে জাতির প্রতি নিষ্করুণ তারা হয়ত সমৃদ্ধির শিখর হতে সর্বনাশের রসাতলে ডুবে যায়। রক্ত ও বিত্তক্ষয়ে বিজেতারাও হয়ে পড়ে নিস্তেজ। শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে তাদেরও লাগে বহুদিন। লোকসান পুরাতে সহ্য করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক দুঃখ।

জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে যা পণ রেখে আবার সেই সর্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষা নতুন করে করতে পারবে।

মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়। খনিজ সম্পদ, তেলের স্রোত যখন এইভাবে বৃথাই ভস্মীভূত হতে বসেছে তখন এই পরিচিত জগতে অন্য কোন ভাবে কার্যকরী শক্তি লুকান আছে কিনা তাই সে খুঁজছে। ঊর্ধ্বে তারামণ্ডলীর বিরাট তেজোসম্ভারের দিকে চেয়ে ভাবছে এইসব জ্যোতিষ্ক তো তারই মত অমিতব্যয়ী, তেজোস্রোতে যা ঢালে তাতো ফিরিয়ে পায় না। বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করছে ওদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রহস্য কি ? পৃথিবী তো এক হিসাবে সূর্যের কায়বস্তুর দ্বারাই গড়া, তাই মাটির মধ্যে অন্য কোন তেজ আছে কিনা তারই সব সময় খোঁজ। পরমাণু জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করতে যে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, তাঁদের কাছেই মানুষ আজ আবার শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছে।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আমার মাস্টারমশাই

জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার

1928 খৃস্টাব্দ। সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। ল্যাবরেটরির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছি আর বড় বড় যন্ত্র নিয়ে সিনিয়র স্টুডেন্টদের কাজকর্ম দেখছি দূর থেকে। শুনে এসেছি পারতপক্ষে কেউ সত্যেন বসুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে সাহস করে না। হঠাৎ ল্যাবরেটরির দরজা খুলে প্রফেসর বসু বাইরে এলেন। বারান্দায় ভ্রাম্যমান ছেলেদের মধ্যে একমাত্র আমি আটক পড়ে গেলাম। একে তো ভয়ে হিমসিম হয়েছি তার মধ্যে কাঁধে প্রচণ্ড হাতবন্দি চেপে বলছেন—'ওরে তুই কাজ করবি?' আমি অমনি বললাম—'করব', ধরে নিয়ে গেলেন ল্যাবরেটরির মধ্যে। বড় ছাত্ররা আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কারণ প্রবাদ আছে সত্যেন্দ্রনাথের কথা যারা বুঝতে চায় তাদেরও মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কা। কাজেই কেউ সহজে তাঁর কাছে কিছু বুঝতে চায় না।

ল্যাবরেটরির ভেতরে নিয়ে গিয়ে অনেকগুলি যন্ত্রের মধ্যে একটি যন্ত্র বেছে নিলেন। তিনি কিছু বোঝালেন এবং বললেন যে, যা তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন আমি বুঝতে পেরেছি কিনা। আমি বললাম—বুঝতে পেরেছি। মাস্টারমশাই (প্রফেসর বসু) বললেন, ছাই বুঝেছ। আমি মনে মনে একটু উষ্ণ যে না হয়েছি তা নয়, মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো দেখি, কি বুঝতে পেরেছ'। আমি যা বুঝেছিলাম বললাম। তখন বললেন যে কাজটা দিয়েছেন এটা হাতে-নাতে করতে একমাস সময় লাগবে। কাজেই একমাস ধরে এখন কাজ কর। আমি মনে মনে ভাবলাম এত সময় লাগবে না। অনেক কম সময়েই কাজ হয়ে যাবে। মাস্টারমশাই আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি এখন কোথায় আছি না আছি কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না বারান্দা থেকে ধরে নিয়ে একটা বড় experiment দিয়ে দিলেন। সিনিয়র ছেলেরা অনেকে বলাবলি শুরু করলেন—এটাই সত্যেন বোসের দস্তুর। যা হোক আমি কাজ আরম্ভ করলাম। আর উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা সবাই একটু চাপা হাসির মধ্যে আমাকে বিদ্রুপ করতে লাগলেন। আশ্চর্যের বিষয় সেই বিদ্রুপের মধ্যে যোগ দিলেন একজন সিনিয়র অধ্যাপক। তিনি ক্লাসের আবহাওয়াটা অনুভব করলেন। বিদ্রুপের পরিবেশের মধ্যে দিব্যি যোগদান করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এই experiment-টা কোন বই দেখে করছ? তখন একটা বই কাছে ছিল—সবাই সেটা নিয়ে সাধারণতঃ প্র্যাকটিস করেন (Watson's Practical Physics Guide Book of Experiment)। অন্যরাও এই বইটা নিয়ে বার বার টানাটানি করছেন। সিনিয়র অধ্যাপক বার বার জেরা করতে লাগলেন—তুমি কোন বই দেখে এই experiment করছ? আমি যতই বলছি আমার প্রসেসটা ঠিক কিনা দেখুন, আমি ঠিক পথে করছি কিনা দেখুন তা না দেখে কোন বই 'ফলো' করছি জেনে কি হবে। তিনি বিদ্রুপের ভাষায় বললেন 'রিসার্চ' করছ বুঝি? ওটা আর একটু পরে আরম্ভ কর। পাশটাশ আগে করে নাও—এই বলে চলে গেলেন। আবার ঘুরে এলেন। আবার সেই এক তর্ক একই পরিণাম। আমি বললাম, আমি যে experiment করছি আপনি বলুন কোথায় এটা আছে, থাকলে দেখিয়ে দিন। তিনি দু-এক মিনিট শুনেই বললেন—'রিসার্চ'-টা পরে করো। তার কথা শুনে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা কিছুটা মেতে গেল। তিনি আধঘণ্টা পর পর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন কিছুতেই আমি যা বলতে চাইছি শুনলেন না। আমি বলতে পারতাম—অধ্যাপক বসু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে সব গোল মিটে যেত। অন্ততঃ সাময়িকভাবে। কিন্তু একটা অভিমান এসে আমার কণ্ঠ রোধ করে দিল। আমি সেই experiment-টাই করে চললাম। কিছু সহানুভূতিশীল ছাত্র এসে বললেন যে, অধ্যাপক বসু বলেছেন একমাস পরে আসবেন। একমাস কি তাঁর খেয়াল থাকবে—দিনক্ষণ তাঁর কিছুই ঠিক থাকে না। ল্যাবরেটরিতে প্রফেসর গুহই সর্বময়। আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। এসব কথায় আমার মন সায় দিল না।

আমি experiment করে চললাম। প্রায় মাসখানেক পার হয়ে গেল। হঠাৎ মাস্টারমশাই এসে উপস্থিত এবং সরাসরি আমার কাছে এলেন। কাজ কিছু এগোল? জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম—আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—একটা স্টাণ্ডার্ড প্রোডাক্ট ছিল সেটার সঙ্গে compare করতে বলেছিলাম আমার product-টা। কোন্‌টা ভাল হয়েছে পুরোনো 'মেথড'-টা ভাল হয়েছে না নতুন মেথড-টা ভাল হয়েছে। বললাম নতুনটা ভাল হয়েছে। আবার বললেন—'ছাই হয়েছে'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি তুলনা করলেন খুশি হয়ে বললেন—তুমি এই কাজটা শেষ কর। বলা বাহুল্য এর মধ্যে বহুবার প্রফেসর গুহর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। অল্প-বিস্তর তর্কাতর্কিও হয়েছে, তিনি যে সেই একবার বেঁকে বসেছেন কিছুতেই তাঁকে আর সোজা করা গেল না। অল্প দিনের মধ্যেই নিয়মিত ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেল। নানা অধ্যাপক নানা বিষয় পড়াতে লাগলেন। আর মাস্টারমশাই নিতেন extra class। ছাত্র পড়াতে তাঁর শ্রান্তিক্লান্তি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই অপরাপর মাস্টারমশাইদের মধ্যে কিছু গলদ আবিষ্কৃত হল। দু-একজন মাস্টারমশাই এমনসব খারাপ কথা বললেন যা অধ্যাপক বসুর কান পর্যন্ত পৌঁছল। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবস্থা নিলেন। এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্র এবং মাস্টার তাদের সম্মিলিত ক্লাস হবে—প্রতি শনিবার দু-ঘণ্টা থেকে চারঘণ্টা করে extra class। বিষয়বস্তু

ঠিক করে অধ্যাপক বসু ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করলেন। যার যেমনখুশি 'বিষয়' নিতে পারে—তার থেকে একটা প্রবন্ধের মত তৈরি করে সে ক্লাসে 'লেকচার' দেবে। মাস্টারমশাইও শ্রোতাদের মধ্যে যোগ দেবেন। যে কোন সময়ে যে কোন ছাত্র বা মাস্টার তার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন। প্রতি ক্লাসে অধ্যাপক বসু প্রথমে শ্রোতার দলে থাকতেন। ক্লাসে প্রশ্ন উঠলে স্বভাবতঃই অধ্যাপক বসু সমস্ত উত্তর দিতেন। তিনি আশা করতেন প্রশ্ন তোলা ও প্রত্যুত্তরদানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই যোগ দেবেন। বস্তুতঃ অধ্যাপক বসু একবার প্রশ্নোত্তরে দাঁড়ালে পরে আর কারও কিছু বলার থাকত না। সবাই মূক বিস্ময়ে অবস্থান করতেন। অপরদিকে ছাত্রদের উৎসাহদানের জন্য মাস্টারমশাই আবিষ্কার করলেন চারটার পর extra class করতে ছেলেদের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। কাজেই তিনি নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচা করে ছেলেদের পর্যাপ্ত পরিমাণ টিফিনের ব্যবস্থা করতেন। আমাদের বিপদ হল টিফিন খেলে আর ক্লাস ছাড়ার উপায় ছিল না।

এই ক্লাসগুলির মধ্যে ছাত্র মাস্টার কাছাকাছি এসে যাবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল সাধারণ মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের থেকে আরও দূরে চলে গেলেন আর অধ্যাপক বসু ছাত্রদের কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। ক্লাসের আভ্যন্তরীণ ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। মাস্টারমশাই সব ছাত্রকেই task অনুযায়ী পুঁথিপত্র—selected portions of books & magazines তৈরি করে দিতেন। সেগুলি পড়ে লিখে আনতে হতো। এই ব্যাপারে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। হাজার পৃষ্ঠার পুঁথির মধ্যে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ সম্বন্ধে তিনি অনায়াসে পাতার সংখ্যা ইত্যাদি বলতেন। ছাত্রদের মনে হতো এগুলিতে মানুষের ভুল হতে পারে। মাস্টারমশাইরও ভুল হতে পারে। কাজেই ভাল করে পরীক্ষা না করে ছাত্ররা প্রায়ই বলেছে এটা ওটা এ পাতায় সে পাতায় নেই। মাস্টারমশাই কেবল একটু অশান্তিবোধ করতেন—নিজের স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে, পরক্ষণেই বই খুলে বলতেন এইতো রয়েছে। এমন কোন দিন পাওয়া গেল না যে, মাস্টারমশাই ভুল করেছেন। আর আমরা ভুল ধরেছি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে ছাত্রদের পক্ষ থেকে অধৈর্য এবং ভুলভ্রান্তির মধ্যে মাস্টার মশাই বিন্দুমাত্র ধৈর্যহারা বা অসন্তুষ্ট হতেন না। হাসিমুখেই সব কথার উত্তর দিতেন। কথা প্রসঙ্গে এমনও হয়েছে উল্লেখিত কোন অধ্যাপকের বয়স সম্বন্ধে কথা উঠেছে—বইপত্র দেখে ছাত্ররা মাস্টারমশাইকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মাস্টারমশাই বললেন সেমিনার থেকে বইখানি নিয়ে এসো। ছাত্ররা অধৈর্য হয়ে বলেছে—বই দেখে কি হবে—এই মাত্র বই দেখেই নোট করে এনেছি। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে—তাতে ছাত্ররা নিশ্চিন্ত না হয়ে মনে মনে একটু আত্মতৃপ্তিই বোধ করেছেন। বললেন—সেমিনার থেকে বইটা নিয়ে এসো। বিশেষ ছাত্র লাইব্রেরীতে না গিয়ে তর্ক করতে লাগল। বই দেখে লিখেছি, আবার বই দেখে কি হবে? মাস্টারমশাই রাগ করলেন না। বেয়ারাকে পাঠিয়ে বই আনালেন। প্রমাণ হলো মাস্টারমশাই-ই ঠিক। মাস্টারমশাই-এর কাছে একজন ছাত্র এসে বললেন—মাস্টারমশাই এত মনে থাকে কি করে? মাস্টারমশাই কাতর হয়ে পড়লেন। একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বলে বসলেন কোথায় আর মনে থাকছে সব 'হেজি' হয়ে যাচ্ছে।

একজন বিশেষ ছাত্র বই দেখে নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ছাত্র-মাস্টার উভয়ই শ্রোতা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে অধ্যাপক বসুর অট্টহাসিতে ঘর ভরে গেল। ছাত্রটি তখন মাস্টার মশাই-এর কাছাকাছি গেছে। পাশে থেকে আর একজন সতীর্থও হেসে উঠলেন। 'মাস্টার-ছাত্র'টি অন্য সতীর্থকে চ্যালেঞ্জ জানালেন —হাসবার কারণ কি? দুই মহাপণ্ডিতে কুরুক্ষেত্রে বাধে আর কি। ইত্যবসরে অধ্যাপক বসু উঠে বলে বসলেন—এই আজকের ভাষণের মধ্যে একটি প্রবাহ আছে—(flow) তাতে ছাত্রটি খুব উৎসাহ বোধ করলেন। ক্লাসটি ছিল সেমিনার। ছেলে-মাস্টার সব একাকার হয়ে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন। মাস্টার মশায়ের উদার এবং মধুর ব্যবহারে ছাত্র-মাস্টার সবাই মুগ্ধ হলেন। পারস্পরিক দূরত্ব ঘুচে গেল। তখন বক্তা ছাত্র (আমি) মাস্টার মশায়ের কাছে পরিষ্কার করে বললেন উক্ত flow সম্বন্ধে তাঁর কি বক্তব্য? সেটা শুনে মাস্টারমশায় অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন—তোমরা যদি এইভাবে নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কর তাহলে এ ধরণের ক্লাস সার্থক হবে। আর যায় কোথায়! আমাদের উৎসাহ চারগুণ বেড়ে গেল। একদিন অসময়ে মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন আমাদের। বোর্ডের চকে সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর নামে খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে যে নিজের ক্ষুধাতেষ্টা সম্বন্ধেও সবসময়ে তাঁর খেয়াল থাকে না। তিনিই কিনা হঠাৎ ঘুরে এসে জনৈক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন—এমন মুখ মলিন দেখছি কেন? উত্তর পাবার আগেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কতকটা ভয়ে এবং কতকটা অবসাদে ছাত্রটি উত্তর করলেন—মাথা ঘুরছে। মাস্টারমশাই—কখন থেকে? 'অনেকক্ষণ' এখন আর ক্ষণ বলতে পারব না।' হাতের চক ছুঁড়ে ফেললেন। আর বললেন—এতক্ষণ কেন বলনি? এই বলে বিষণ্ণ হয়ে ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। মাস্টারমশাই কিন্তু এখানে কোন মনোভাবের বিকাশ করলেন না। ক্লাসের বাইরে দু-একজন মাস্টার বললেন—সাবধান, সত্যেন বোসের ক্লাস ফলো করতে চেষ্টা করো না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই মাস্টারমশাই বুঝতে পারলেন—ছাত্রদের অঙ্কশাস্ত্রের দৌড়টা। কাজেই এবারে ঠিক হলো একাদিক্রমে তিনমাস মাস্টারমশাই শুধু অঙ্ক শিখাবে—বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্কশাস্ত্র শেখাবেন। তখন একটা ডবল অনার্স ক্লাস খুললেন পরবর্তী বছরের জন্য। ছেলেরা এভাবে আস্তে আস্তে মাস্টারমশাইকে কাছে পেয়ে একদিন জনৈক ছাত্র ভরা

ক্লাসের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে বসল—বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধ্যাপক তাঁদের সবারই ডক্টরেট' ডিগ্রী আছে, আপনার নেই কেন স্যার? খুব খারাপ কথা হয়ে গেল। মাস্টারমশাই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—'I do not know what is there in a career but if you mean studies I may be of some service to you'। তিনি মোটেই দুঃখিত বা রুষ্ট হলেন না। এতে প্রতি ছাত্র ক্রমেই তাঁর কাছে হৃদ্যতা পেয়ে পেয়ে আপনার চেয়ে আপনতর হতে লাগল। অনেক দরিদ্র ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারবে না, ফিস দিতে পারবে না। এই হেতু তিনি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন প্রয়োজনবোধে অকুণ্ঠ ভাবে তাদেরকে অর্থদান করতেন। কোন বিনিময় কামনা করতেন না। তাছাড়া বিশেষভাবে ভাবান্বিত ছেলেদের জন্য তাঁর soft corner সদাজাগ্রত থাকত। নমুনা স্বরূপ বলা যায় মাস্টারমশায়ের অঙ্কপ্রীতির সঙ্গে অসাধারণ সঙ্গীত-প্রীতির এক ঘটনার কথা। তিনি যখন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে) মশগুল, বাইরে থেকে মাসখানেকের জন্য তাঁর বন্ধু সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ রায় তাঁর বাড়ী গিয়ে থাকতেন আর দিনরাত সঙ্গীতচর্চা করতেন। আর মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে সে চর্চায় তন্ময় হয়ে যোগ দিতেন। এমনি একদিনে জনৈক ছাত্র প্রফেসর বসুর বাড়ীর বারান্দায় (যেখানে সঙ্গীতচর্চা করছেন দিলীপ রায়) উপস্থিত হয়ে ইশারা করলেন—অধ্যাপক বসু মুহূর্তে রসভঙ্গ করে উঠে পড়লেন এবং ছাত্রটাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গীতশিল্পী দিলীপ রায়ের চোখ দুটো লাল হয়ে গেল কিন্তু কোন লাভ হলো না। অধ্যাপক বসু ভিতরে গিয়েই পিছনের দরজা বন্ধ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার? উত্তরে ছাত্রটি বলল—'টাকা লাগবে।' কেন প্রশ্ন করলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা? ছাত্র সংখ্যাটি কাগজে লিখে দিল। মাস্টারমশায় সেইমত টাকা নিয়ে খামে পুরে ছাত্রটির পকেটে দিলেন। দরজার দিকে চোখ রাখলেন কেউ দেখে না ফেলে আর দরজা ধাক্কা না দেয়! বললেন—'পালা।' প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাও তিনি এমনি ভাবে তুলে ছাত্রদের দিতেন। এদিকে দিলীপ রায় তাঁকে উপেক্ষা করে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে দেখে হতভম্ব! তিনি গান গাইছিলেন আর গুণমুগ্ধ শ্রোতা শুনছেন। শুনতে শুনতে একি কাণ্ড!! অনেক সময় এমন হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র—ফিস দিতে পারত না। এ খবর মাস্টারমশায়ের কানে নিজে বা বন্ধু দিয়ে পৌছে দিতে পারলে টাকার অভাব হতো না। কোন্ সাবজেক্ট, তাঁর ছাত্র কিনা, জিজ্ঞাসা করতেন না।

তখন সবে ইউনিভার্সিটিতে মহিলা ছাত্র এসেছে। তারা এসে সত্যেন বোসকে ধরলেন তারা অঙ্ক শিখতে চায়। তাঁর ছাত্র নয় এমন অনেকেই তাঁর থেকে সাহায্য পেতেন। অধ্যাপক তাদেরকে অঙ্ক শেখালেন। এর মধ্যে বিশেষ কয়েক জন ছাত্রী ঠিক করলেন বোসের কাছে গিয়ে আদর কুড়োবেন। বললেন—ইকনমিকস-এর মধ্যে অঙ্ক আছে। মাস্টাররা বোঝাতে পারছেন না। অধ্যাপক বোসই একমাত্র পারেন। ছাত্রীরা তাঁকে জানালেন অঙ্ক ঠেকে যায়, সাহায্য চাই। অধ্যাপক বোস বললেন—বি. এস-সি.-তে অঙ্ক ছিল তো? সাতদিনের মধ্যে 'রিভাইজ' করে ফেলো।' (তিনি ভুলে গেছেন কাদের পক্ষে তা সম্ভব)। তারপর সমস্যার সমাধান করবেন। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই তারা হতভম্ব। বুঝলেন—তারা পড়াশুনা করে নি। 'আগে ওগুলো পড়ে নিয়ে পরে আসবে।'—জানালেন তিনি। পড়াও হবে না আর তারা আসবেও না! ছেলেদের সঙ্গে সবসময়ই সহজ মেলামেশা করতেন। 'মুখ শুকনো দেখছি, আজকে তোমাদের কিছু খাওয়া হয় নি?—শুধোতেন অনেককে। দু-চারজন বলল—খাওয়া হয় নি। চাপরাশিকে ডেকে খাবার আনতে বললেন। একটা গামলায় আম ও দুধক্ষীর। তিনি আগেই বলে রেখে-ছিলেন তাকে। তাঁর নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন বোধ ছিল না। একদিন মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে চটি পায়ে এসেছেন। বোঝা গেল স্নানের আগের অবস্থায় ছিলেন, ঘণ্টা বাজতেই চলে এসেছেন। খাওয়া হয় নি। 'Math. is the language of Physics'—বলতেন তিনি। নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন সর্বক্ষণ। সাদা চকের গুঁড়োয় সারাদেহ ভর্তি। সমানে বলেন—Tell me। কিন্তু কেউ উত্তর করে না। নিজেই প্রশ্ন করেন ও উত্তর করেন। ছাত্রকে বলেন—ক্লাসে সুবিধা-অসুবিধার কথা বল না কেন? সাধারণতঃ চারটের পর ক্লাস হতো না। কিন্তু ছ'টা পর্যন্ত উনি ক্লাস নিতেন। খাবার আনাতেন, খাবার খেয়ে পালাতে পারতাম না। বছর ভর করে যাচ্ছেন এই ক্লাস···কোন ক্লান্তি নেই। স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ছাত্রদের বই দেখে লেখারও ভুল ধরিয়ে দিতেন অনায়াসে। অধ্যাপক বসুর ভুল হয় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলতেন—ভুল যার হতে পারে না সেই সত্যেন বোস। বিশ্ব-পরিচয় গ্রন্থে এই স্বীকৃতি আছে।

একটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। মাস্টার গোপনে প্রশ্ন দিয়ে উত্তর লিখেছে। ভাবছে ফার্স্ট ক্লাস পাবে। 'পরীক্ষা তো হয়ে গেছে বাড়ী গিয়ে খাওদাও—রেজাল্ট তো যা হবার হবেই।' ছাত্রটি বলল—কেউ পারে নি আমি একটা পেরেছি। উত্তর মেলে নি। অধ্যাপক বসু ছেঁড়া খামের উপর অঙ্কটা করে দেখালেন—এত আছে রেজাল্ট? ঠিক আছে। রিজনস-এর ভুল হতে পারে না। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রের lecture preparation হয়েছে? আরও দু-মাস লাগবে। ঠিকসময়ে Lecture পেলেন। বই না দেখে বলতে বললেন। নিজেরা সব চিন্তা করে ব্যাখ্যা করে বললে তিনি খুব খুশী হতেন। বললেন—তুমি experiment কম করছ। আমি নানা অসুবিধার জন্য কাজ করব না বলায় তিনি অসময়ে অর্থাৎ

রাত এগারটায় ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে বললেন। বৃদ্ধ চাবি নিয়ে বসে আছে—অধ্যাপক বোসের অনুমতি ছিল। মাস্টাররা বললেন—রাত-বেরাত ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে দামী দামী জিনিষপত্র চুরি হতে পারে। মাস্টারমশায় বললেন—'তাহলে আমি চোর।' কেউ তেমন সুবিধা করতে পারল না। হাডসন সাহেব ছাত্র অজিত চক্রবর্তীকে লাঠিচার্জ করেছিল। বেদম মেরেছিল পুলিস। বোস বললেন—'তোমাদের preparation হয় নি—সময় হয় নি, এখনই মারামারি করো না।' আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল হাডসন-কে মারার। দু-বছর বাদে মারলাম হাডসনকে। তিনি জানতেন—এই ছেলেরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তিনি ছিলেন সর্বদা ছাত্রগত প্রাণ। ছাত্রদের স্বার্থে—তাদের পড়াশুনার স্বার্থে তিনি সবকিছু করার জন্য সবসময় তৈরি ছিলেন। নিজের স্বার্থের কথা কোনদিন ভাবেন নি, ভাবার অবসর পান নি। দেশের অন্যতম প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার দুরভিসন্ধি জানতে পেরে তিনি বিরাট এক দায়িত্বের হাতছানিকে অনেক সহজেই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। ফাইলবন্দী প্রশাসকের পদের চেয়ে পড়াশুনোর জগৎ তাঁর কাছে অনেক বেশী কাম্য। আমার জীবনে তাঁর স্নেহের ঋণ কখনো শুধতে পারি নি। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন আমি পড়াশুনোর জগতে থেকে বিজ্ঞান সাধনা তথা দেশসেবায় ব্রতী হই। কিন্তু যখনই জানতে পেরেছেন দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি আমরা, তখনই দু-হাতে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর সাধ্যাতীত পরিশ্রমে সাহায্য করেছেন আমাদের। স্বাদেশিক সত্যেন বোসের যে পরিচয় পেয়েছি তা যে কোন অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীর দানের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। মানুষের মন যে কতবড় হতে পারে তা সত্যেন বোসের সংস্পর্শে না এলে জানতে পারতাম না। অথচ এই লোককে যোগ্য সম্মান দিতে আমার দেশবাসী কার্পণ্য করেছে। রাজনীতির যূপকাষ্ঠে তাঁর ভাগ্যে জোটে নি নোবেল প্রাইজ। অথচ তিনি কী দিয়েছেন আর কত কী দিতে পারতেন ভেবে দেখি নি আমরা। আত্মভোলা এই মাস্টারমশাই কিন্তু এসব কোনদিন ভ্রূক্ষেপও করেন নি। যোগ্য লোককে যোগ্য সম্মান না দেওয়ার লজ্জা আমাদের, সামান্য এইসব সঙ্কোচ তাকে স্পর্শ করবে কিভাবে? বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সঙ্গে কলকাতার বাড়ীতে দেখা করেছি—ঠিক একভাবে ছেলের মতো আদর করেছেন। অকৃতদার এই অকেজো লোকটার থাকা-খাওয়ার চিন্তা তাঁকে ব্যথিত করেছে। নিজের চেয়ে যেন আমার চিন্তায় তিনি বেশী বিষণ্ণ। কানে শুনি না সেজন্য তাঁর কত আক্ষেপ! সন্ন্যাসী এই বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসতে পারায় আমি সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করি। তিনি আমার সত্যিকার মাস্টারমশাই আজীবনের।

[বিপ্লবী জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদারের স্মৃতিচারণমূলক এই লেখাটি অমর দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত। অনুলেখিকা—দীপ্তি ভট্টাচার্য।

"সমগ্র জাগতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ সসীম মানববুদ্ধির অতীত রহিলেও শুধু ন্যায়সঙ্গত বিকলন প্রথায় প্রত্যেক বাস্তব বা জৈব ঘটনার হেতুনির্দেশ সম্ভব। যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক, জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহাতে আবিষ্কারের কোন ন্যায়নির্দিষ্ট পন্থা নাই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়। এই সংযোজন বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন।"

*   *   *   *

"সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত সৌন্দর্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায় তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানববুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহার সাধনাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয়। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিক ভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এই জন্যেই নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বহির্জগতের হেতুসূত্রে যোজিত মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত। এইরূপে হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া সে বহির্জগতের স্বরূপ সত্তাকে ধরিতে চাহে।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বোস-সংখ্যায়নে তৃতীয় প্রবন্ধ

নন্দদুলাল সেনগুপ্ত*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রধানতঃ তার 'বোস-সংখ্যায়নে' সীমাবদ্ধ। অবশ্য তাঁর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অবদান বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর একত্রীভূত ক্ষেত্রবাদের (Unified Field Theory) মৌলিক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সমীক্ষা এবং সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু 'বোস-সংখ্যায়নে'র মূল প্রবন্ধ 'প্লাঙ্কসূত্র এবং আলোককণা প্রকল্প (Planck's law and light-quantum hypothesis ভিন্ন আচার্য ঐ বিষয়ে এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিতে আরও মৌলিক এবং ব্যাপক পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য (wider perspective) দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মৌলিকতায় এই দুটি প্রবন্ধের বিশেষ স্থান আছে। কারণ প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তু কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অবদানের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আচার্যের সংখ্যায়ন সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বস্তুর উপস্থিতিতে তাপ বিকিরণের স্থিতিস্থাপকতা (thermal equilibrium of radiation in presence of matter) বৈজ্ঞানিক সমাজে সাধারণ ভাবে অনাদৃত। অন্যতম কারণ এই প্রবন্ধের শেষে আইনস্টাইনের বিরূপ সমালোচনা ছিল। কারণ তাঁর (আইনস্টাইনের) ধারণা আচার্য বোসের প্রবন্ধের একটি বিশেষ সূত্র ধরে তার পরিণতি হিসাবে কোনও ক্ষেত্রে প্রকৃতি বিরুদ্ধ (বিশেষতঃ তাপ-বলবিদ্যা প্রসূত)। কিন্তু পরবর্তীকালে (সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে) দেখা গেল—এই প্রবন্ধে আচার্য যে মূল সূত্রের অবতারণা করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক। এতদ্‌সত্ত্বেও আচার্যের এই প্রবন্ধ সুধীসমাজে শুধু অনাদৃতই নয় অবহেলিত। এই প্রবন্ধের আইনস্টাইনের প্রতিকূল সমালোচনার উত্তর পৃথকভাবে দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। কিন্তু আচার্যের প্যারী থেকে লেখা (27 January, 1925) চিঠিতে জানা যায় তিনি আইনস্টাইনের আপত্তি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এই আপত্তি যাতে আর স্থান না পায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তৃতীয় একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংখ্যায়ন সম্বন্ধে লিখেছিলেন এবং আইনস্টাইনকে তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধের মূল সূত্রে সম্ভবতঃ আইনস্টাইনের প্রবল আপত্তি ছিল, সেই হেতু এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় নি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধের কোনও অনুলিপি (copy) আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। যদি একান্তই থেকে থাকে সেটা হয়ত প্রিন্সটনে আইনস্টাইন এস্টেটের কোনও অবহেলিত কোণে পড়ে আছে। প্রবন্ধটি খুব সম্ভবতঃ প্যারীতে লেখা। কিন্তু তার কোনও অনুলিপি আচার্য আদৌ রেখেছিলেন কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়—আর থাকলেও সেটা দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা সেটাও অজ্ঞাত। লেখকের বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য আচার্যের সংখ্যায়নে দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বর্তমান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যৎকিঞ্চিত সমালোচনা এবং অপ্রকাশিত ও নিরুদ্দিষ্ট (untraceable) সংখ্যায়নের তৃতীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের অবতারণা। অতি স্বাভাবিক ভাবেই এটা অসম্পূর্ণ, কারণ আচার্য কি পদ্ধতিতে নূতন করে বস্তুর উপস্থিতিতে তাপ-বিকিরণের স্থিতি-স্থাপকতার আলোচনা করেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লেখক অবসরমত অনেকবার আচার্যকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পায় নি, বরঞ্চ প্রায়ই ক্ষোভের সঙ্গে তিনি উত্তর দিতেন, "ওটা বড়কর্তার (আইনস্টাইন) পছন্দ হয় নি। তথাপি বিভিন্ন স্থানে (কলিকাতা, মুম্বই এবং মুসৌরী) আলোচনার মাধ্যমে ঐ প্রবন্ধের মূল সূত্র এবং বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুটা পরিষ্কার বোঝা যায়। লেখকের বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা সেই বিষয়কে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করা এবং আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পরিস্থিতিতে তার সমীক্ষা করা।

আচার্যের এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবন্ধের মূল বিষয় "বস্তু ও বিকিরণের পরস্পর প্রতিক্রিয়া" (interaction between matter and radiation)। এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে অতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সংখ্যায়নের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়ের অবতারণা অপরিহার্য। আচার্যের প্রথম প্রবন্ধের 'প্লাঙ্ক সূত্র এবং আলোককণা বাদ' (Planck's Law and light quantum hypothesis) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক সাহা ও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলে সাধারণ ভাবে জানা আছে। কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, তার গভীরতা বিশেষতঃ শাস্ত্রচর্চার দিক থেকে অনেক বেশী। এ বিষয় ও'র (আচার্যের) সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় যেটুকু জানি তার অবতারণা এখানে প্রয়োজন বিশেষতঃ আচার্যের ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। এটা বোধহয় সত্য নয় যে প্লাঙ্ক সূত্রের সম্পূর্ণ কোয়াণ্টামভিত্তিক ব্যুৎপত্তি (derivation), যা তত্ত্বের দিক থেকে নিতান্তই প্রয়োজনীয় (logical necessity), সেটা আচার্যের অজ্ঞাত ছিল। অধ্যাপক সাহা আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আরও সুনির্দিষ্টভাবে পাউলির (1923) লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উপর এবং পাউলির পদ্ধতি তাঁর (অধ্যাপক সাহার) নিকট ঠিক গ্রহণীয় বলে মনে হয় নি—এই উক্তি করে।

এই সমস্যাটা বুঝতে হলে 1917 খৃস্টাব্দে আইনস্টাইনের একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্লাঙ্ক সূত্রের কণাবাদিক ব্যুৎপত্তি। আইনস্টাইন এখানে দুই প্রকার মৌলিক অবস্থান্তর প্রথার (transition processes) অবতারণা করেছিলেন, (i) প্রভাবিত অবস্থান্তর

* টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, বোম্বে

(induced transition), (ii) স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তর (spontaneous transition)। প্রথমতঃ বিকিরণের উপস্থিতিতে—বস্তুকণার কোনও শক্তিমাত্রা (energy level) থেকে অন্য শক্তিমাত্রায় যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ বিকিরণের অনুপস্থিতিতে উচ্চ শক্তি মাত্রা থেকে স্বাভাবিক ভাবে নিম্নশক্তিমাত্রায় আসা। আইনস্টাইন এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে আরও সাধারণ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য দেখিয়েছেন এরেনফাস্ট-এর সঙ্গে যুগ্ম একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে (1923)। যদিও আইনস্টাইন উক্ত প্রবন্ধে (1917) সম্পূর্ণ ভাবে কণাবাদের ভিত্তিতে প্লাঙ্ক সূত্রে উপনীত হতে পারেন নি তথাপি তাঁর এই প্রবন্ধটা পরবর্তীকালে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় ক্রমবিকাশে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। পাউলি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও (1923) ইলেকট্রন ও বিকিরণের তাপস্থিতিস্থাপকতা (thermal equilibrium between electron and radiation), ডিবাই-কম্পটন সমীকরণের সাহায্যে অর্থাৎ ইলেকট্রন এবং ফোটনের মৌলিক প্রতিক্রিয়ার (interaction between electron and photon) সূত্র ধরে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্লাঙ্কের সূত্রে উপনীত হবার জন্য পাউলিকে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের সম্ভাব্য পরিমাপ (probability amplitude) ঐ শক্তিমাত্রায় বর্তমানের অর্থাৎ পরিবর্তনের আগের অবস্থান সংখ্যা (occupation number) না নিয়ে ভবিষ্যতের সংখ্যা নিতে হয়েছিল। আচার্যের কাছে এটা কোন রকমেই গ্রহণীয় হয় নি। তাঁর নিজের ভাষায় (ব্যক্তিগত আলোচনায়) 'এ যেন অতীত ও বর্তমানে কি হবে সেটা ভবিষ্যত ঠিক করবে (future directing present and past)। এটাই আচার্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মতন করে নূতন ভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। বোস-সংখ্যায়ন সম্পর্কে আর একটা প্রসঙ্গের উত্থাপনের প্রয়োজন মনে হয়। বোস-সংখ্যায়নের নূতনত্ব কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই বলা হয় এই সংখ্যায়নে মৌলিক কণার অভিন্নতার (identical and indistinguishable) ধারণা ভিত্তি করে আপেক্ষিক সম্ভাব্য গণনা করা হয়। কিন্তু কোনও এক সমষ্টির মধ্যে সংখ্যায়নের কথা ভাবতে যাবার আগেই সমষ্টির উপাদানের (constituent) অভিন্নতা ধরে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং মৌলিক কণাদের অভিন্নতা গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা বস্তুর গতিবাদের (Kinetic Theory) অবতারণা করেছিলেন তাঁরাই ওতপ্রোত ভাবে মেনে নিয়েছিলেন যদিও এটাকে পরিষ্কার ভাবে সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। বস্তুতঃ বোস-সংখ্যায়নের মূল হল, আচার্যের নিজের ভাষায় 'এটা হচ্ছে সমষ্টির বিভিন্ন পরিস্থিতির (সাধারণতঃ শক্তির) উপর সংখ্যায়ন—(It is a statistics over states)"।

আলোচ্য দ্বিতীয় এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় প্রবন্ধ প্রসঙ্গে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে এই দুটিই প্রথম প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম প্রবন্ধে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাকে সাধারণতঃ বলা হয় স্থিতিশীল ব্যুৎপত্তি (static derivation)। সমষ্টিকে স্থিতিশীল (equilibrium) অবস্থায় থাকতে হলে তার কি কি গুণ দরকার, যথা সবচেয়ে বেশী সম্ভাব্য অবস্থা (maximum probability), গুলির বিচার-বিবেচনা। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির অন্যান্য অপরিবর্তনীয় গুণাবলীর সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হতে হবে। অপর পদ্ধতি যেটা পরের প্রবন্ধে অনুসরণ করা হয়েছে—সেটাকে বিবর্তমান গতিশীল (dynamic) পদ্ধতি বলা চলে।

আচার্যের দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়, 'বস্তু এবং বিকিরণের স্থিতিস্থাপকতা'। যে সময়ে (1924) লেখেন তখন বস্তু এবং বিকিরণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার (mechanical model of interaction) ধারণা বর্তমানের মতন সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না। সুতরাং আচার্য অগ্রসর হয়েছিলেন যে সমস্ত গুণাবলী অপরিবর্তনীয় (বিশেষতঃ শক্তি) তাই ধরে, বস্তু ও বিকিরণের মধ্যে পরিবর্তনের একটা সম্ভাব্য মূল্যবোধ আরোপ (probability amplitude of basic processes) করে। আইনস্টাইনের 1917 খৃস্টাব্দের প্রবন্ধেও এর অবতারণা করা হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে সবচেয়ে সহজ সমষ্টি ও সহজ অবস্থার পরিবর্তন নিয়েই সমস্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আচার্য এই প্রবন্ধে সহজ অবস্থায় সীমাবদ্ধ না রেখেই অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এই সাধারণ পটভূমির বিস্তার (generalization) ভিন্নও দ্বিতীয় প্রবন্ধে আইনস্টাইনের 1917 খৃস্টাব্দের প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর একটা বিশেষ গুণগত পার্থক্য ছিল। আইনস্টাইন দুই প্রকার মূল পরিবর্তনের যেমন (i) প্রভাবিত এবং (ii) স্বতঃস্ফূর্ত—এই দুই অবস্থান্তর-ই ধরে নিয়েছিলেন এবং তার মূল্যবোধ আরোপিত করেছিলেন। কিন্তু আচার্য দ্বিতীয় প্রবন্ধে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ধরে নিয়ে (অর্থাৎ প্রভাবিত পরিবর্তন আদৌ না নিয়ে) অগ্রসর হয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন—আইনস্টাইন-এরেনফাস্ট (1923) এবং পাউলির (1923) পৃথক ভাবে আলোচিত বিষয়বস্তু এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ দুটি রূপ (special cases)। আর আচার্যের আলোচনা শুধু মাত্র এই দুটি রূপেই সীমাবদ্ধ রাখার কোনও কারণ নেই। কিন্তু আইনস্টাইন প্রধানতঃ আপত্তি জানিয়েছিলেন এই কারণে যে বোসের পথে অগ্রসর হলে তাপ-গতিবিদ্যায় প্রসূত কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলে উপনীত হওয়া যায়,—যেটা কোনমতেই স্বীকার্য নয়।

এই আপত্তি আচার্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এ-জাতীয় আপত্তি যাতে পুনরায় না আসতে পারে তা থেকেই বোধ হয় তৃতীয় অপ্রকাশিত এবং নিরুদ্দিষ্ট প্রবন্ধের উৎপত্তি। ব্যক্তিগত আলোচনায় যতটুকু জানতে পেরেছি, সেটা এই প্রকার—

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আচার্য প্রভাবিত অবস্থান্তর না ধরে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তর নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন ; সেজন্য এবার তিনি প্রস্তাবিত পরিবর্তন ধরে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন না ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আশানুরূপ ফলাফলও পেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। আইনস্টাইনের একমাত্র আপত্তির কারণ (যেটা আচার্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় জেনেছি)—স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ (spontaneous emission), যেটা আইনস্টাইন (1917) প্রথম অবতারণা করেছিলেন সেটাকে তিনি (আইনস্টাইন) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন বলে মনে করতেন। এ বিষয়ে আইনস্টাইন এবং আচার্যের মৌখিক আলোচনার (খুব সম্ভবতঃ একাধিকবার) সার অংশ আচার্যের নিকট শুনেছি, সে সম্বন্ধে আমি পূর্বেই লিখেছি। তবু এখানে পুনরাবৃত্তি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আচার্য বলতেন অপ্রকাশিত তৃতীয় প্রবন্ধের প্রশ্নে এলেই বড়কর্তা (আইনস্টাইন) আমার মুখ বন্ধ করে দিতেন এই বলে—"আচ্ছা, বোস তুমি কি মনে কর না, শুধু একটা কণা শক্তির উচ্চমাত্রায় থাকলে তা-কি অন্য কিছুর প্রভাব ব্যতিরেকে, নিম্নশক্তিমাত্রায় আসবে না ?" আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত অপছন্দতা এই অপ্রকাশের কারণ কিনা—ঠিক জানা নেই। উত্তরসূরীদের কাছে আলোচনার প্রধান উপাদান হিসাবে সেই প্রবন্ধের কিন্তু কোন অনুলিপি নেই। আচার্যের প্যারী থেকে আইনস্টাইনকে লেখা চিঠি ভিন্ন এই প্রবন্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।

উপসংহারে দুটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। এই দুটিই আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এ বিষয়ে আচার্যের সঙ্গে আমার কথনও আলোচনা হয় নি। সুতরাং এর ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

প্রথমতঃ তৎকালীন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ভাবধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আচার্যের দ্বিতীয় এবং (অপ্রকাশিত নিখোঁজ) তৃতীয় প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য একই। আইনস্টাইন (1917) প্রভাবিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তরের অবতারণা করার পরও প্লাঙ্ক সূত্রে উপনীত হবার জন্য—র‍্যালে-জীনস্ সূত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন—ঐ দুই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত পরিমাপের সম্পর্কের জন্য। আর ঠিক এইটুকুর জন্যই—আইনস্টাইনের প্লাঙ্কসূত্রে উপনীত হওয়ার ত্রুটি থেকে যায়। কারণ কণাবাদের বাইরেও বিদ্যুচ্চুম্বক তরঙ্গীয় ভাবধারার সাহায্য নিতে হয়। আচার্য হয়ত ভেবেছিলেন শুধু মাত্র একটা পরিবর্তন ধরে অগ্রসর হলে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না—এবং হয়েছিলও তাই। কিন্তু কুটিল ইতিহাসের চক্রে এই দুই পদক্ষেপই আজ সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং বিস্মৃত।

দ্বিতীয়তঃ শেষ জীবনে এই তৃতীয় প্রবন্ধের কথা বলতে গিয়ে আচার্য একবার আক্ষেপের সঙ্গে ভিন্ন সুরে কথা বলেছিলেন। সেই সুরের মাত্রা ধরেই আমি তাকে বলেছিলাম "স্যার, মনে হচ্ছে আজকে আপনি আইনস্টাইনের ঐ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন" (স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার তখন আইনস্টাইন আর ইহলোকে নেই।) আচার্য উত্তরে বলেছিলেন—'হ্যাঁ, বলতাম উচ্চশক্তি মাত্রায় কেবল একটি কণাই আছে, কিন্তু কি হবে বা না হবে দেখার জন্য তুমিও নেই আমিও নেই।" পরবর্তীকালে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় এই উত্তর কত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ডিরাক (1926) প্রথম বিদ্যুচ্চুম্বক ক্ষেত্রকে কোয়ান্টীয়করণের (quantization of electromagnetic field) অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন যে—এই প্রথার অবতারণা না করলে কিছুতেই স্বত:স্ফূর্ত অবস্থান্তরের অবতারণা করা যাচ্ছে না। প্রভাবিত অবস্থান্তরের মাপ অধ্যাপক ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আবিষ্কারের গোড়ার দিকেই করেছিলেন। আজ অতীতের এই ক্রমবিকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়—ইতিহাসের পরিহাস। ক্ষেত্র কোয়ান্টীয়করণের ফলস্বরূপ আজ আর প্রভাবিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তরের মধ্যে কোন গুণগত (qualitative) প্রভেদ নেই। প্রভেদটা শুধুমাত্র পরিমাণের (quantitative)। বোধহয় এই কারণেই আপাতদৃষ্টিতে পৃথক সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করেও আচার্য একই উত্তর পেয়েছিলেন। সে বিষয়ে পুনরানুধাবনের বা মূল্যায়নের পথ রুদ্ধ, কারণ তৃতীয় প্রবন্ধের কোনও অনুলিপি নেই।

FOR FINANCING ON SECURED ASSETS

Consult

Samudra Vijay

86, Canning Street,
Calcutta-700 001
Phone : 35-5026

নতুন 'বোসনে'র সন্ধানে

বিমলেন্দু মিত্র*

যে সব প্রাথমিক ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির ওপরে নির্ভর করে পদার্থতত্ত্বের বুনিয়াদ খাড়া করা হয়েছে সেই সব বোঝাবুঝির কাঠামো যতদিন থাকবে ততদিনই আচার্য সত্যেন্দ্র-নাথের বসু-সংখ্যায়ন (Bose-statistics) তার একটি আশ্চর্য ভিত্তি হিসেবে টিঁকে থাকবে। পদার্থতত্ত্বের কত নতুন জ্ঞান ও আবিষ্কার যে এই ভিত্তির ওপরে নির্ভরশীল তার হিসেবের ফর্দ মস্ত হয়ে দাঁড়াবে।

পরমাণুর জগতে যাদের মূলকণা বলা হয় তাদের স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী গোষ্ঠীভুক্ত করবার জন্যে যে সব গুণগুলির খোঁজ নেওয়া হয় তাদের মধ্যে সাধারণত আছে ভর, বিদ্যুতাধান ইত্যাদি ও আরও একটি বিশেষ মৌলিক গুণ, যার নাম দেওয়া হয়েছে Spin angular momentum বা ঘূর্ণন-কৌণিক-ভরবেগ। সব মূলকণাকেই এই গুণের বিচারে দুটি গোষ্ঠিতে ভাগ করা হয়েছে, (1) যাদের কৌণিক ভরবেগ মূল এককে মাপলে দাঁড়াবে $\frac{1}{2}$ অথবা তার পূর্ণসংখ্যা দিয়ে গুণফল এবং (2) যাদের কৌণিক ভরবেগ শূন্য (zero) অথবা 1, 2, প্রভৃতি পূর্ণ সংখ্যা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলকণাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বোসন' বা বোস-কণা (Boson) কারণ এই সব কণিকা আচার্য বসুর গড়ে দেওয়া সংখ্যায়নের সূত্র মেনে চলে।

মৌলিক কণাগুলির ঘূর্ণন বা spin অবশ্যই লাট্টুর ঘুরের মত কোনও ব্যাপার নয়। মূলকণার জগতের ব্যাপারস্যাপার বুঝতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বা কোয়ান্টম গতিতত্ত্ব দিয়ে বুঝতে হয়। Spin বা ঘূর্ণন হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটা বিশেষ আইডিয়া। অঙ্কের কাঠামোয় মাপা যায়। আর মূলকণাদের ভরসংখ্যা, আধানসখ্যার মত spin-সংখ্যাও তাদের বিশেষ চরিত্রের অন্যতম।

খুব সম্প্রতি স্টিভেন ভাইনবার্গ, আবদুস সালাম ও শেলডন গ্লাসো নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অনেকেই "একত্রীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব" বা Unified Field Theory সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। বস্তুত গত বছর পনেরো ধরেই মূলকণাদের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ব্যাপারে কার্যকরী নানাধরণের বল (force)-কে একটিমাত্র মৌলিক বলের বিভিন্ন রূপ হিসেবে বোঝবার চেষ্টা চলছিল। প্রকৃতিতে নানা বিভিন্ন জাতের বল কাজ করছে এ ব্যাপারটা স্বয়ং আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেন নি, যদিও আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখি যে অন্তত চারটি ভিন্ন জাতের বলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তারা হল মহাকর্ষ বল, যা দুটি ভরের মধ্যে আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে; বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল যা আমাদের পরিচিত, পরমাণুকেন্দ্রের 'দৃঢ়বল' (nuclear strong force) যা পরমাণুর কেন্দ্রকণাগুলিকে (নিউট্রন ও প্রোটন) বেঁধে রেখেছে ও মূলকণাগুলির মধ্যেকার 'ক্ষীণবল' বা weak force। শেষোক্ত বলটি খুব চেনা নয়,—এই বলের অস্তিত্বের জন্যে নিউক্লিয়াস থেকে বিটা-কণিকা নির্গত হচ্ছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে strong force ও weak force দুই জাতের বলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সালাম ও ভাইনবার্গের সাম্প্রতিক তত্ত্বে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল (electromagnetic) ও কেন্দ্রীয় ক্ষীণবল (weak force) দুটিই মূলগতভাবে একটিমাত্র 'বল' (force) হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় মূলকণাদের ক্রিয়াবিক্রিয়ার 'মডেলটি' একটু অন্যরকম। কল্পনা করা হয়েছে যে মূলকণারা নিজেদের মধ্যে 'বিক্রিয়া' করবার কালে ('আকর্ষণ'ও একটি বিক্রিয়া) তারা নিজেদের মধ্যে 'বল' ক্ষেপণ করে (transmit করে),—ক্ষেপণের পদ্ধতি হচ্ছে নিজেদের জুটির মধ্যে তৃতীয় একটি কণা তারা যেন দেওয়া-নেওয়া (exchange) করে। এই আদান-প্রদানের ফলেই যেন বিক্রিয়া-বলের জন্ম হচ্ছে, এই বলকে exchange force বলা চলে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিষয়, কোন ছবি এঁকে তা বোঝানো শক্ত। তবু মোটামুটি একটা তুলনা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক রাম ও শ্যাম খেলার মাঠে একটি টেনিস বল নিজেদের মধ্যে লোফালুফি করছে। যতক্ষণ তারা ঐ বলটি পরস্পর দেওয়া-নেওয়া করছে ততক্ষণ তারা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছে না, যেন অদৃশ্য এক 'বলে' (force) তারা বাঁধা রয়েছে। যতক্ষণ লোফালুফি চলছে ততক্ষণ ঐ বাঁধনের অস্তিত্ব। ঐ force-কে আমরা exchange force বলতে পারি। তত্ত্বীয় ব্যাপারটির এত সরল তুলনা দেওয়াতে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্য আপত্তি করতে পারেন।

1935 খৃস্টাব্দে জাপানী পদার্থবিদ্ ইউকাওয়া পরমাণু কেন্দ্র থেকে বিটাকণা নির্গমনের বিষয় চিন্তা করছিলেন। জানা গেল যে পরমাণুতে দুই ভিন্ন ধরণের বল কাজ করছে,—(1) প্রোটন নিউট্রনদের একত্র বেঁধে রেখেছে অসম্ভব শক্তিশালী নিউক্লিয়-বল যা অবশ্যই strong force খেতাব পেতে পারে, আর (2) আর একটি দুর্বলশক্তির ক্ষীণবল রয়েছে তার জন্যে বিটা কণার জন্ম, যার নাম weak force দেওয়া গেল।

ইউকাওয়া আরও বললেন, force এর কার্যকারিতা তৃতীয় exchange-কণিকাদের জন্যেই সম্ভব হচ্ছে এবং ঐ কার্যকারিতা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে তা নির্ভর করছে মধ্যবর্তী ঐ exchange-কণা কতটা ভারি তার ওপরে। মধ্যবর্তী কণা যত বেশি ভারি force-এর সীমা তত ছোট গণ্ডিতে নিবদ্ধ। নিউক্লিয় strong force যে কণা দেওয়া-নেওয়া করছে তা

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93/1 আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-700 009

হল মেসনকণা, তারা অপেক্ষাকৃত ভারি, নিউক্লিয়-বল সুতরাং খুব সামান্য পরিধির মধ্যে কাজ করছে (10^{-15} মিটার মাত্র)। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল' বা electramagnetic force কিন্তু অসীম-বিস্তারী কারণ সেক্ষেত্রে exchange-কণা হল ফোটন (photon বা আলোকণা) এবং ফোটনের কোন ভর নেই।

এখন ব্যাপার হল এই strong forcr ও weak force দু-ক্ষেত্রেই exchange-কণারা ভিন্ন হলেও তাদের একটা জাতি-গত মিল রয়েছে, তারা সবাই 'মধ্যবর্তী ভেক্টর বোসন' (Intermediate vector boson), তাদের spin-সংখ্যা 1 অথবা শূন্য, তারা সবাই বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে।

1947 খৃস্টাব্দে প্রথম পাই-মেসন আবিষ্কার হয়। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। এখন জানা গেছে যে তথাকথিত মৌলিক কণার সংখ্যা অনেক। কিন্তু তারা সকলেই বোধহয় আরও ছোট কোন ভিন্ন মূলকণা দিয়ে গড়া। প্রোটন, নিউট্রন, মেসন এরা কেউই সে হিসেবে মৌলিক কণা নয়, যে প্রাথমিক কণা দিয়ে এরা গড়া তা হল "কোয়ার্ক" (quark) নামধারী বস্তু। কোয়ার্করা জোট বেঁধে মেসন প্রভৃতি তৈরি করেছে। তাহলে কোয়ার্কদের জোট বাঁধবার বল কি strong force ? ওদের জোট বাঁধবার বলের exchange-কণা কি ? কোয়ার্ক নিজেরা কি আধানযুক্ত কণা বা তাদের ভর কি রকমের ?

কোয়ার্করা আধানযুক্ত, তাদের আধান ইলেকট্রনের আধানের এক তৃতীয়াংশ। তাদের জোট বাঁধবার exchange-কণা হল 'গ্লুঅন' (gluon)। এ বল strong force। গ্লু-অনের spin-সংখ্যা 1, অর্থাৎ এরাও 'মধ্যবর্তী ভেক্টর বোসন'।

ক্ষীণবল বা weak force-এর ব্যাপারটা আলাদা। এর টানাটানির সীমা খুবই ছোট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষীণ-বল ক্ষেপণকারী exchange-কণাও 'ভেক্টর বোসন'। যেহেতু এরা খুবই ছোট জায়গার মধ্যে কার্যকরী এই ভেক্টর বোসন কিন্তু বেশ ভারি অন্তত মেসনের চেয়ে ভারি।

আইনস্টাইনের সূত্র বলছে শক্তি আর পদার্থের ভর একই জিনিস। বৃহৎকায় কণাত্বরক যন্ত্রে মেসন সৃষ্টি করা যায়। ভাবা যায়, যখন নিউট্রন-প্রোটনের বাঁধনকে কাটাবার মত প্রভূত শক্তির কণা দিয়ে নিউক্লিয়াসকে বিদীর্ণ করা যায় তখন ঐ বাঁধনশক্তিই exchange-কণা মেসনের রূপ নিয়ে ধরা পড়ে। ক্ষীণবলের exchange-কণা নতুন ভেক্টর-বোসনদের স্বভাবচরিত্র কি রকমের হবে, তাদের ভর কত, তার ঠিক আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাইনবার্গ, সালাম ও গ্লাসোর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে সর্বপ্রথম আন্দাজ পাওয়া গেল যে weak force-এর ভেক্টর বোসনরা তিন ধরণের হবে, একটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত, একটি নেগেটিভ ও একটি তড়িৎহীন। এদের নাম যথাক্রমে W^+ W^- ও Z^0 বোসন-কণা। এদের ভর শক্তির মাপে বললে দাঁড়াবে যথাক্রমে 79·5 Gev, 79·5 Gev ও 90 Gev, বলাবাহুল্য Gev মানে 10^9 ইলেকট্রন ভোল্ট। এরা সত্যিই ভারি কারণ প্রোটনের ভর 0·93 Gev মাত্র।

তার মানে দাঁড়াল, কণাত্বরক যন্ত্র (accelerator) যদি এত শক্তিশালী কণা তৈরি করতে পারে যার আঘাতে প্রোটন নিজে ভেঙ্গে পড়ে কোয়ার্কে ভাগ হয়ে যেতে পারে তবে হয়ত $W\pm$ অথবা Z^o কণার আবির্ভাব হবে, অবশ্য যদি বিক্রিয়ার জন্যে অন্তত 90 Gev শক্তি পাওয়া যায়। সাধারণত শক্তিশালী কণাদের ত্বরকযন্ত্রে স্থির পদার্থের ওপরে ফোকাস করে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে অনেকটা শক্তিই স্থির নিউক্লিয়াসকে স্থানচ্যুত করার কাজেই নষ্ট হয়, প্রকৃতপক্ষে কণাবিশ্লিষ্ট করার কাজে শক্তি পাওয়া যায় অল্পই। তাই শুধু 90 Gev পেলেই নিশ্চয়ই ঐ ভেকটর বোসনদের জন্ম প্রত্যক্ষ করা যাবে না, দরকার হবে আরও ঢের বেশি শক্তির। এরকম ভয়ানক শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র তৈরি করার আশা বছর কতক আগেও দুরাশা ছিল। এখন চিত্র বদলে গেছে; সে কথায় পরে আসছি।

আগেই বলেছি যে সালাম-ভাইনবার্গ তত্ত্বে বলা হয়েছে শক্তির ঐ রকম উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক-বল আর ক্ষীণশক্তিবল (weak-force) একই রকমের ব্যবহার করছে; সেজন্যে ঐ শক্তিস্তরে ফোটন ও Z^o-কণাকে আলাদা বলে চেনা যাবে না। দুই-ই এক বলে মনে হবে। কথাটা খুব বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, কারণ ফোটনের কোন ভর নেই আর Z^o-কণা তো বেশ ভারি। কি করে তারা একই কণা বলে প্রতীয়মান হবে? এটাও একটা উপমা দিয়ে বলি। একই জল তাপমাত্রার ভিন্নতায় কখনও 'কঠিন' বরফ, কখনও বা 'গ্যাস' বাষ্প। তেমনই বিভিন্ন শক্তিমাত্রায় বিক্রিয়াকারী ভেকটর-বোসন কখনও ফোটন কখনও বা Z^o কণা। তত্ত্বে কল্পনা করা হয়েছে আদিতে ফোটন ও W^+, W^- ও Z^o কণা সবই ছিল ভরহীন; প্রাকৃতিক সাম্য নষ্ট করে এরা বিভিন্ন শক্তিমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন কণারূপে আবির্ভূত হতে পারে। সালাম-ভাইনবার্গ তত্ত্বে যেহেতু বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপার ও weak force ক্ষেত্রের ব্যাপারকে এক করে দেওয়া হয়েছে, এই তত্ত্বের নাম হয়েছে electro-weak theory।

1973 খৃস্টাব্দ নাগাদ একটা অদ্ভুত পরীক্ষাফল জানা গেল। ইউরোপের CERN ল্যাবরেটরি ও আমেরিকার Fermilab ল্যাবরেটরিতে এই পরীক্ষা হল। জানা গেল যে ক্ষীণবল-বিক্রিয়ায় (weak interaction) আধানযুক্ত কণা ছাড়াও আধানহীন কণারাও উচ্চশক্তির বিক্রিয়া ঘটাতে পারে এবং বিক্রিয়ার 'মধ্যবর্তী ভেকটর বোসন' যা exchange কণা তাও আধানহীন অর্থাৎ তারা Z^o-কণা। এই পরীক্ষাফলই neutral weak current আবিষ্কার বা 'আধানহীন ক্ষীণবল প্রবাহ' নামে বিখ্যাত হল আর এর পরই electro weak তত্ত্বের আবিষ্কর্তা সালাম-ভাইসবার্গ গ্লাসো নোবেল পুরস্কার পেলেন।

এখন চেষ্টা চলতে লাগল শুধু Z^0-কণা নয়, সত্যি সত্যিই W^+, W^- এবং Z^0 তিনটি ভেকটর বোসন খুঁজে পাবার। কিন্তু সেজন্যে সরাসরি নিউক্লিয়-কণা ভাঙ্গতে হবে এবং তার জন্যে যে শক্তির সাইক্লোট্রোন যন্ত্র দরকার সাধারণ কারিগরি-বিদ্যায় তা তৈরি করা অসম্ভবপ্রায় !

সাধারণ পরীক্ষার মত স্থির বস্তুকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী প্রোটনকণা নিক্ষেপ করলে এ সমস্যার সমাধান কখনও হত না। কিন্তু 1976 খৃস্টাব্দে Cline, Rubia ও McIntyre একটি নতুন প্রস্তাব করলেন। এ'রা বললেন সাইক্লোট্রোনের কক্ষের মধ্যে চৌম্বকক্ষেত্রে যদি একই সঙ্গে প্রোটন ও প্রতি-প্রোটন (অ্যান্টিপ্রোটন, antiproton) ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা করা হয় তবে প্রোটন যেদিকে ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করবে অ্যান্টিপ্রোটনও ঠিক তার উল্টো দিকে ঘুরে ঘুরে একই শক্তি সঞ্চয় করবে। এরা যদি শক্তি পাবার পর মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধায় তবে কার্যত তা দাঁড়াবে ডবল শক্তিতে দুই নিউক্লিয়কণার সরাসরি সংঘাত। 100 Gev শক্তির সাইক্লোট্রোন থেকে প্রকৃতপক্ষে 200 Gev শক্তিতে 'প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন'-সংঘাত ঘটান যাবে। এ হলে কণা ভেঙ্গে কোয়ার্ক পাওয়া যাবে, ওদের বলের মধ্যবর্তী exchange কণা ভেকটর-বোসন $W\pm$ ও Z^0 সৃষ্টি হবে। সুতরাং কাজ শুরু হল CERN ও Fermilab-এর সাইক্লোট্রোনকে সামান্য রদবদল করে যন্ত্রকে ঠকিয়ে (!) ডবল শক্তি পাবার। CERN প্রায় 400 Gev শক্তির প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটন তৈরি করল। Fermilab বলছে 1985 খৃস্টাব্দের মধ্যে সে 2000 Gev শক্তি সৃষ্টি করবে। CERN সম্প্রতি জানিয়েছে তারা নাকি $W\pm$ 'ভেকটর বোসন পেয়েছে। 1985 খৃস্টাব্দে Fermilab পরীক্ষায় আরও নিশ্চিতভাবে তা পাওয়া যাবে।

সুতরাং সালাম-ভাইনবার্গের বলা, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুই বল, electromagnetic ও weak force যে আসলে একই শক্তির লীলা, তা বোঝা গেল। আমাদের মাস্টার মশাই সত্যেন বোস যে সংখ্যায়ন গড়ে দিয়ে গেছেন তার ছকে ফেলেই ভেকটর বোসন চিহ্নিত করার ফলে প্রকৃতির এই জটিল রহস্যের যবনিকা কিছুটা অপসারিত করা গেছে। তিনি ও আইনস্টাইন সারা জীবন অঙ্ক কষে গেছেন, মহাকর্ষ শক্তি ও বিদ্যুৎ-চৌম্বকশক্তি এ দুটিকে একই মৌলিক শক্তির দুইরূপ হিসাবে প্রমাণ করতে। ভবিষ্যৎ হয়তো তা সম্ভব করবে,—প্রকৃতিতে হয়ত সত্যি একটি মাত্র বলেরই অস্তিত্ব আছে,—যা দেখতে পাই হয়তো সবই তার রকমফের মাত্র।

বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশঃ উপরের দিকে চলেছে। তার সভ্যতা ক্রমশঃ উর্ধ্বপথে চলেছে। এটা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে। কাজেই, সে ভাবে নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করলে মানুষের জয়রথ এগোবে না। প্রকৃতির শক্তির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানবের সভ্যতা। তাই সে শুধু দর্শনশাস্ত্র আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে চায় না। অন্যদিকে শুধু দর্শনশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা ভাবি যে আমরা মানুষ, সকলে এক ও এই ভাবে হিংসদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারবো, তাহলে এতদিন পর্যন্ত সে কথা কেবল বৃথা মনোভাবেই পর্যবসিত হয়েছে—একথা অবশ্য হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারবো। যে সব পরাতত্ত্বের কথা আমাদের দার্শনিক অতিথি বলেছেন, সে সবই আমাদের দেশে নূতন নয়। নিতান্ত ঘরোয়ানা জিনিস এই ভারতে—অন্তত আমাদের গর্বই এই। কবি ডি. এল. রায় একবার লিখেছিলেন যে "আমাদের তোমরা অনেক লাঠি মেরো কিন্তু বাবা একবার গীতাখানা পড়ে দেখতে পার।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে ইচ্ছে করে যে এই ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা যেখানে যেদেশে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল বলে আমরা মনে করি, সেখানেও কোনকালে হিংসা দ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয় নি। অবশ্য যাঁরা খাঁটি ব্যক্তি, তাঁরা এর চমৎকার কাটান দিয়ে গেছেন। সে গল্প এখানে করতে ইচ্ছা করছে। বশিষ্ঠ ঋষি চিরকাল বলতেন যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। রাজা দিলেন তাঁর পিছনে হাতি দিয়ে তাড়া, বশিষ্ঠ অবশ্য টিকি না বেঁধেই দৌড়তে আরম্ভ করলেন তখন শিষ্য রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "একি মহামুনি, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ? কিছুই নয়, এ তো সব মিথ্যা।" ঋষি এর উত্তরে বললেন, "আমি যে যাচ্ছি এটাও তো মিথ্যা।" অবশ্য এই ভাবে আমাদের সভায় মিথ্যা ও সত্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা চালালেও জগতের মধ্যে বিরাট দারিদ্র্যও অজ্ঞতার যে রূপ প্রকট রয়েছে, সেটাকে শুধু মায়া বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না। অন্তত পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে, তার মনে এই দ্বৈতভাব থাকবেই। মানুষ যতদিন আছে, ততদিন সে চেষ্টা করবে এই সমস্ত জিনিস কবে মানুষের জীবন থেকে মুছে ফেলা যায়। কি করে এমন এক সমাজ গড়া যায় যার মধ্যে এইসব আকস্মিক বিপদপাত যেন একেবারে না থাকে। তার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বিরাট কল্পনা। আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন যে, শুধু দার্শনিক দিয়ে যদি পৃথিবী চলে থাকত (এই রকম নাকি এক সময়ে ভারতে ছিল) তাহলে বোধ হয় পৃথিবী থেকে দ্বেষ, হিংসা তাতে লোপ পেত না। বিজ্ঞানচর্চা থাকত না, কাজেই আণবিক বোমার আবিষ্কার হোত না। তবুও নিপাত করার ও উৎসন্ন দেবার যে সব সাধারণ অস্ত্র ছিল সে সব অস্ত্রের ব্যবহার চলত এবং সেগুলি ঠিক সেইরকমই নির্মম ও সর্বনেশে। মানুষকে মানুষ ভেবে মানুষ যে বিশেষ সম্মান করে এসেছে এতকাল, তা আমার মনে হয় না। শুধু আজকের বিংশ শতাব্দীতে মানুষ সেইভাবে সাধনার পথে সবে এগোতে সুরু করেছে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বোস-সংখ্যায়নের প্রথম গবেষণা-পত্রের সঙ্গে

আইনস্টাইনকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি

PHYSICS DEPA........
Dacca University

Dated the 4th June 1924.

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that (I have tried to deduce the coefficient $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ in Planck's Law independent of the classical electrodynamics) only assuming ~~that~~ ~~[illegible]~~ that the ultimate elementary regions in the Phase-space has the content h^3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through ~~the~~ your writings. I don't know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S. N. Bose

জার্মানীতে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার ছবি

Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese.

Von Bose (Dacca-University, Indien).

(Eingegangen am 2. Juli 1924.)

Der Phasenraum eines Lichtquants in bezug auf ein gegebenes Volumen wird in „Zellen" von der Größe h^3 aufgeteilt. Die Zahl der möglichen Verteilungen der Lichtquanten einer makroskopisch definierten Strahlung unter diese Zellen liefert die Entropie und damit alle thermodynamischen Eigenschaften der Strahlung.

Plancks Formel für die Verteilung der Energie in der Strahlung des schwarzen Körpers bildet den Ausgangspunkt für die Quantentheorie, welche in den letzten 20 Jahren entwickelt worden ist und in allen Gebieten der Physik reiche Früchte getragen hat. Seit der Publikation im Jahre 1901 sind viele Arten der Ableitung dieses Gesetzes vorgeschlagen worden. Es ist anerkannt, daß die fundamentalen Voraussetzungen der Quantentheorie unvereinbar sind mit den Gesetzen der klassischen Elektrodynamik. Alle bisherigen Ableitungen machen Gebrauch von der Relation

$$\varrho_\nu d\nu = \frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3} E,$$

d. h. von der Relation zwischen der Strahlungsdichte und der mittleren Energie eines Oszillators, und sie machen Annahmen über die Zahl der Freiheitsgrade des Äthers, wie sie in obige Gleichung eingeht (erster Faktor der rechten Seite). Dieser Faktor konnte jedoch nur aus der klassischen Theorie hergeleitet werden. Dies ist der unbefriedigende Punkt in allen Ableitungen, und es kann nicht wundernehmen, daß immer wieder Anstrengungen gemacht werden, eine Ableitung zu geben, die von diesem logischen Fehler frei ist.

Eine bemerkenswert elegante Ableitung ist von Einstein angegeben worden. Dieser hat den logischen Mangel aller bisherigen Ableitungen erkannt und versucht, die Formel unabhängig von der klassischen Theorie zu deduzieren. Von sehr einfachen Annahmen über den Energieaustausch zwischen Molekülen und Strahlungsfeld ausgehend, findet er die Relation

$$\varrho_\nu = \frac{\alpha_{mn}}{e^{\frac{\varepsilon_m - \varepsilon_n}{kT}} - 1}.$$

Indessen muß er, um diese Formel mit der Planckschen in Übereinstimmung zu bringen, von Wiens Verschiebungsgesetz und Bohrs Korrespondenzprinzip Gebrauch machen. Wiens Gesetz ist auf die klassische

Anmerkung des Übersetzers. Boses Ableitung der Planckschen Formel bedeutet nach meiner Meinung einen wichtigen Fortschritt. Die hier benutzte Methode liefert auch die Quantentheorie des idealen Gases, wie ich an anderer Stelle ausführen will.

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তাধারা

গুণধর বর্মন*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস তাঁর বিশিষ্ট গবেষণা 'বোস-সংখ্যায়নে'র জন্যই শুধু প্রখ্যাত নন, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (নিজের গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়েও) তাঁর আরও মূল্যবান গবেষণা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মধারা রয়েছে। তাতে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিজ্ঞানের বাইরে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার যে স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ তাও তুলনাহীন। সমগ্র দেশ, সমাজ-সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে তাঁর যে প্রতিভাময় চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা, সে-সবের মূল্যায়ন তাঁর জীবৎকালে যতখানি হয়েছে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তার গুরুত্ব আরও অধিক হয়েই রয়েছে। তাঁর স্বল্পপরিমিত নিজস্ব লেখা এবং ভাষণাদির মধ্যে তাঁর সেই মহান্ চরিত্র এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। ঐসবের সর্বত্রই তাঁর সেই মহান গবেষণার চিন্তাধারা এবং তদনুরূপ জীবনদর্শন প্রতিফলিত যাতে সমষ্টির মান নির্ণয়েই তাঁর লক্ষ্য, ব্যষ্টির প্রাধান্যে তাঁর আকর্ষণ নেই, অথচ ব্যষ্টির (ব্যক্তির) স্বাভাবিক বিকাশ ও তার স্বাধীন সত্তায় তিনি আগ্রহী। যারা আচার্য বোসের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে আসার সুযোগ পান নি এবং ভবিষ্যতের সবাই তাঁর সেই লেখা ও ভাষণাদি থেকেই তাঁকে যথাসম্ভব বিচার করবেন।

মাতৃভাষাতেই এদেশের বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা শুধু নয় শিক্ষাব্যবস্থার সবকিছুই মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালনের জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টার কথা সুবিদিত। আর দেশ ও জাতির জন্য এবং তারই সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ প্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিকতা ও কর্মপ্রেরণা কত গভীর তা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর সেই সীমিত লেখা ও ভাষণাদির মধ্যেই। সেই সবের সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর রচনার সংকলন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। সেই লেখাগুলি পড়তে পড়তে সহজেই মনে আসে কত সহজ ও সুন্দর ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে পেরেছেন পাঠকের সামনে। বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ প্রবন্ধকে যেন গল্পের আকারে বলে চলেছেন, শব্দের আড়ম্বর ও ভাষার কারিকুরি না করেই, ভাবের স্বচ্ছ প্রকাশ অতি সরলভাবে ফুটে উঠেছে সর্বত্র। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা হলেও বিজ্ঞান-না-জানা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যাঁরা শব্দ ও বাক্যের মোটামুটি অর্থ সহজে বুঝতে পারেন তাঁদের পক্ষে আচার্য বোসের লেখা (বিশেষ বিজ্ঞান প্রবন্ধ ছাড়া) সাধারণ প্রবন্ধগুলি মোটেই কঠিন নয়, বরং জ্ঞানানুসন্ধান বা সাধারণভাবে কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের আছে তাঁদের কাছে এই লেখাগুলি অনেক সময় গল্প-উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। রচনা সংকলনের প্রথম লেখা (বোধ হয় তাঁর বাংলায় প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যেও এটি প্রথম) 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধটি থেকে একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে।

"যে জ্ঞান আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প-বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদ সমৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হতে পারে, এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিত শাস্ত্র।—এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা—যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা জড়-জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়ম সমূহই বরণ করেছিলেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়মকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো যেতে পারে তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা এটাই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান",—এই লেখা আজকের যুগের নয়। সেই 1930-31 খৃস্টাব্দের কথা, যখন এদেশের বৃহত্তর জনসমাজে বিজ্ঞান চেতনার অঙ্কুরোদ্গমই হয় নি বলা যেতে পারে। সাধারণ স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনও একেবারে প্রাথমিক (elementary) স্তরেই রয়েছে। সেই সময় এক সাধারণ পত্রিকায় ('পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়) এই ধরনের লেখার গুরুত্ব কতখানি তা আজ ঠিক অনুভব করা যাবে না। কিন্তু 54 বৎসর পরেও বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর এবং বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষার প্রসার ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের সেই লেখাকে পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কোনমতেই কমে যায় নি। বিজ্ঞান কি জিনিষ, সেই বিজ্ঞানের বিবর্তন এবং তার অগ্রগমনে বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে সেই যুগে (কি এই যুগেও) জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ ও সাধারণ জ্ঞানের কথা কত সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় তা এই 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধটিতে ফুটে উঠেছে। এতে ভাষা ও ভাবের প্রকাশ কত সরল ও বলিষ্ঠ। পরের অনুচ্ছেদটিতে তা আরও স্পষ্ট।

"প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড় পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করবার জন্য অতি আদিমকাল থেকেই

* 64এ গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-4

মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহুদিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়ন শাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি বস্তুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ, পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণীদেহের উপাদান সমূহ সবই ওই আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ স্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরি করে দেখাচ্ছেন"।

খুব সহজ বর্ণনা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাস সংস্কারে আবদ্ধ দৈববাদী দেশের জনমানসে বিজ্ঞানচেতনা সৃষ্টিতে এই কথাগুলির বিশেষ প্রভাব ও প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞানের সমস্যা বা বিশেষ বিজ্ঞান তত্ত্বকে জনসাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য করানর জন্য মাতৃভাষায় সে সবের প্রকাশ ও প্রচার যেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এদেশের বৃহত্তর জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরি করা আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিনতর কাজ। কারণ আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবারই মনে জন্মগতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস—সৃষ্টির সব কিছুই দৈবাধীন। 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' আলোচনা করতে গিয়ে সেই জমাট বাঁধা অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে একটু নাড়া দিয়ে তিনি বলছেন: 'প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে সব জিনিস তৈরি করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি বস্তুই আছে এবং অনেক স্থলেই···সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরি করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন।' —তারপরেই বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তার সমস্যার কথা—যা একটু ধৈর্য ধরে পড়লেই সাধারণ শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারবে। "শক্তির সন্ধানে মানুষ"—প্রবন্ধে তাঁর ভাব ও ভাষা প্রকাশে আরও মুনশীয়ানা দেখা যায়। প্রবন্ধের আরম্ভটিই কি সুন্দর।

"বস্তুর রাজ্যে বৈচিত্র্যের অবধি নেই। কয়লা, অভ্র, লবণ, হিঙ্গুল ইত্যাদি কত খনিজ রোজ মাটির মধ্য থেকে বেরোচ্ছে। কত উদ্ভিদ কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, নিজের ভাবে বাড়ছে আবার আয়ু ফুরালে মরছে, প্রাণশক্তির তেজে খাদ্যের পরিপাক চলছে, কায়বস্তুতে তৈরি হচ্ছে কত বস্তু, আবার কত বস্তুরও বিকার ঘটছে, নাশ হচ্ছে। প্রাণীর শরীরে সৃষ্টি হচ্ছে মেদ, মাংস, রক্ত ও রস। প্রাণের রসায়নশালায় কত জিনিষের ভাঙা গড়া চলছে। গাছের ফলের মধ্যে বীজের মধ্যে তার কাণ্ড, ত্বকের মধ্যে কত জিনিষ পাশাপাশি মিশে রয়েছে।" এ যেন কবিতার ছন্দে এক রম্যরচনা, অথচ অল্পকথায় বিশাল পরিধির বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা। তারপরেই—তত্ত্বচিন্তা—"জগতের মধ্যে জন্মমৃত্যু, ভাঙা গড়া, যোগাবিয়োগ, সবেরই রহস্য বুঝতে চায় মানুষ। সে যে শুধু পৃথিবীর কথাই ভাবে তা নয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ছায়াপথ, সুদূরের নীহারিকা—সবই সে কৌতূহলের চোখে দেখছে। নিজের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে ভরতে চায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে। দূরে কাছে, এমন কি নীহারিকার মধ্যেও যে সৃষ্টির খেলা চলছে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে তার নিয়ম সে বুঝতে চায়। কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাষ্পময় নীহারিকা জমাট বেঁধে তারা-জগতের জন্ম দিলে, আবার কোন দুর্যোগের ফলে তারকা ভেঙে-চুরে গ্রহ-জগতের সৃষ্টি হল, এ সবের সার তথ্য তার কল্পনা, তার প্রতিভা ধরতে চায়। চোখে দেখা যায় না যে সূক্ষ্ম কণারাশির জগৎ, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জানতে চায় তার অন্তরের মর্মকথা।"—কি অপূর্ব বর্ণনা! সহজ ভাষায়, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যে, সাবলীল ধারায় কয়েক লাইনের মধ্যে জীবনমৃত্যু, প্রাণীদেহ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারকার উৎপত্তি বিনাশসহ প্রায় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে এক বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের ভাবরাজ্যে টেনে নিয়ে যায় পাঠকের মনকে। অথচ তারই মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরির পূর্ণ পটভূমি। এইখানেই সত্যেন্দ্র রচনার বৈশিষ্ট্য। নীহারিকার মধ্যে তারকার সৃষ্টি এবং সেই তারকা ভেঙেচুরে গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি সবই "অব্যর্থ নিয়মের বশে"—কোন খেয়ালী স্রষ্টার খেয়ালে নয়—এই সুস্পষ্ট বিজ্ঞান চিন্তার অবতারণা, সেই কাব্যময় অল্প কথার বর্ণনাতেই! বিজ্ঞানে গভীর কল্পনার প্রতিভা, ভাববাদী দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিজ্ঞান—"নিজের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে ভরতে চায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে,"—"প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে"। আর ভাববাদী দর্শন—সৃষ্টির অপার রহস্যকে কোন কাল্পনিক স্রষ্টার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হতে চায়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে, তাই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সেই কল্পিত "সর্বশক্তিমানে"র অসীম দয়ার দান হিসাবে প্রকৃতির সাধারণ শক্তিগুলি যখন ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে তখন মানুষকে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নতুন "শক্তির সন্ধান" করতে হচ্ছে। সেইখানেই বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা, খেয়ালী স্রষ্টার দয়ার উপর নির্ভর করে বসে থাকলে আর চলবে না। বিজ্ঞান কিভাবে শক্তির সন্ধান দিয়েছে ও দিচ্ছে তারই বর্ণনা এই "শক্তির সন্ধানে মানুষ" প্রবন্ধে, তার শেষ কথা—"যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক।"•

এই ভাবে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা রচনা সমূহে একদিকে বৃহত্তর জনমানসে বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সহজ ভাষায় সবার বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা, অন্যদিকে বিজ্ঞানের আদর্শ এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে যথাযথ অনুভব করিয়ে তা কার্যকরী করার ঐকান্তিক আহ্বান—সর্বত্রই পরিস্ফুট, এমনকি শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথাগুলির মধ্যেও। তাঁর 'আইনস্টাইন' শীর্ষক শুদ্ধ বিজ্ঞান চিন্তার প্রবন্ধটিতে আপেক্ষিকবাদ নিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত (যদিও প্রকাশের

ভাষা কিছুটা কঠিন, গুরুগম্ভীর সাহিত্যধর্মী)। আর আপেক্ষিকবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে নিউটনীয় মতবাদের কোথায় ত্রুটি, এবং বিজ্ঞানের সামগ্রিক প্রগতি ও পরিকল্পনায় পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের কি করণীয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব সহজ বলিষ্ঠ পথনির্দেশ চিত্রিত। বিজ্ঞানের প্রকৃতিও পদ্ধতির বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামত ঃ—

"সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত সৌন্দর্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায় তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানব-বুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহার সাধনাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এইজন্যই নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বহির্জগতের হেতুসূত্রে যোজিত মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত,…প্রকৃতির প্রত্যেক জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ মানব বুদ্ধির অতীত বলিয়াই ঐ প্রতীকের (প্রতিকৃতির) রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সরল ঘটনা সমূহের বিকলন ও পুনঃসংযোজন লইয়াই বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সংযোজন ও বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই পদার্থবৈজ্ঞানিককে গণিতের আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই অপূর্ণ হইলেও বৈজ্ঞানিকের প্রতীক রাজ্যে অশুদ্ধতা অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নাই। …যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক, জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে আবিষ্কারের কোন ন্যায় নির্দিষ্ট পন্থা নেই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়।"

"…প্রকৃতির নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন। …সেই আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে, তাহাদের সংযোজনার ফলাফলের সহিত বাহ্যজগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে আমরা যথার্থ প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কিনা। —ঐ বিজ্ঞান অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কিনা।"

"পদার্থবিজ্ঞানে নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল (1934 খৃস্টাব্দ) অনেকেই হেতুবাদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্তে তাহার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই নবতমবাদ অণু-পরমাণুর রাজ্যে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে যে হেতুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে তাহাই আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস"—এখানে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মনের প্রতিফলনও পরিস্ফুট।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় যেসব শুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি বুঝতে হলে পাঠককে অবশ্যই একটা বিশেষ মান পর্যন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। না হলে বিজ্ঞানের কথাগুলি সম্যক বোঝা যাবে না। তবে বিদেশী ভাষায় লেখা এই জাতীয় প্রবন্ধ বুঝতে হলে সাধারণ বিজ্ঞান-জানা লোকদেরও যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। সেই অসুবিধা তার প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির সময় থেকেই। বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার সময় ভাষার প্রতিবন্ধকতা বিষয়বস্তুর হৃদয়ঙ্গমে অনিবার্য বাধার সৃষ্টি করে। তাই পরীক্ষা পাশের জন্য অধিকাংশ অংশকে প্রায় মুখস্থই করতে হয়। তাতে প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলেও এমনকি তাতে উচ্চনম্বর পেলেও—সেই বিষয়ের সাধারণ অনুভূতি তার মনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিস্তার লাভ করে না। ফলে বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেও এদেশের উচ্চশিক্ষিত মহলে যথার্থ বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরি হয় নি মুখস্থ বিদ্যা হিসাবেই সমস্ত জ্ঞানটা একটা পোশাকী আড়ম্বর রূপেই ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ও আচার-আচরণে তা আটপৌরে ব্যবহারে লাগে না। তাই উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষা পেয়েও ব্যক্তিগত বা সমষ্টি জীবনে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ও অভ্যস্ত অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব থেকে তাঁরা সহজে মুক্ত হতে পারেন না। আবার সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে বিদেশী ভাষার প্রাধান্য থাকায় শিক্ষা জীবনের প্রথম থেকেই ধীশক্তির বেশীর ভাগ সেই ভাষা আয়ত্তে লাগিয়ে শিশুমনের বৃহত্তর অংশের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা আসে। তাদের বেশীর ভাগের মনে স্বকীয় ভাবনাচিন্তা ও মৌলিক আবিষ্কারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার উন্মেষ হয় না। ধরা-বাঁধা ছকে মুখস্থ করে এইভাবে কষ্টকৃত শিক্ষিতদের নিয়ে এদেশে একটা কৃত্রিম সমাজের সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা বৃহত্তর সমাজ থেকে স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। জ্ঞান ও শিক্ষায় উন্নত হয়েও তাঁরা সমগ্র দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকেই বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন—ঐ কৃত্রিম শিক্ষার জন্যই। আর তাঁদের হাতেই রয়েছে দেশের সমগ্র পরিচালনার ভার। তাই সত্যেন্দ্রনাথের রচনা ও ভাষণের একটা বড় অংশই হচ্ছে তাঁর 'শিক্ষা চিন্তা', শুধু মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চা নয়, সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিতে এমনকি সরকারী প্রশাসন কাজেও মাতৃভাষার পূর্ণ ব্যবহারের কথা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা দিয়েই এবং নিজে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেই বিষয়ে দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করেই সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং তাতে মাতৃভাষার প্রচলন সম্পর্কে তিনি শুধু কিছু লিখে ও বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি তাঁর চিন্তাধারাকে একটি স্থায়ী আন্দোলনের রূপ দিয়ে গেছেন,—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং তার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে। সেই আন্দোলনের ফলে দেরীতে হলেও এই রাজ্যে শিক্ষার উচ্চ

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাবে। কিন্তু দুঃখের কথা এ-বিষয়ে বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতা বা কোন পরামর্শের চেষ্টা সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন বোধ করেন নি এবং করছেন না। এই রাজ্যে 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে' এবং শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের আজীবন চিন্তা-ভাবনা এবং বিজ্ঞানসম্মত কর্মধারা যথাযথ প্রচারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এখনও সক্রিয় ভাবে আগ্রহী। তাঁর 'শিক্ষা-চিন্তার' উপর লেখা ও ভাষণগুলি রচনা সংকলনে প্রকাশিত, কিন্তু আমাদের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষিত সমাজের কতজন তা অনুধাবন করে দেখেছেন, সেটাই প্রশ্ন। কারণ শিক্ষিত সমাজের বৃহত্তর অংশই আজও সত্যেন্দ্রনাথের সেই বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপন করতে পারেন নি, তাঁর অমূল্য রচনার প্রচার ও প্রসার তাই একান্তই সীমিত। ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষার বিপক্ষে আগেও যে বিরুদ্ধ মতবাদ ছিল, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় সেই কাজ চালু করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে তাতে বিক্ষোভের সম্ভাবনা। সেখানে সুস্থ জনমত তৈরি করার দায়িত্ব কে নেবে ?

1963 খৃষ্টাব্দে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে "শিক্ষা ও বিজ্ঞান" সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন ঃ

"আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়ই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিন্ত হতে পারে না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চাইছিলেন—সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কিনা। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা জোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।"

তার পরে "শিশু ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধে শিশুদের কিভাবে শিক্ষারম্ভ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে সেই প্রবন্ধে বলেন— "বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা কেন শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে ? তারা নোট মুখস্থ করে, প্রশ্নপত্র চুরি করে কোন রকমে দায়িত্ব মিটিয়ে দিতে চায়, কেন তাদের এ মনোভাব ? এর জন্যে দায়ী কে ?—দায়ী আমরা শিক্ষকরা। আমরা তাদের সামনে বস্তুর পাহাড় তুলে ধরেছি—আর চেয়েছি সেই পাহাড় তারা উদিগরণ করুক। বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারি নি। তাই তাদের মনও আমরা পাই নি। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও কারখানার কর্তাদের সম্পর্কের মত। পদে পদে তাই ছাত্ররা আজ বিদ্রোহ করে।"

1962 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস স্মরণ করে বলেছেন ঃ—

"আমাদের বিদেশী শাসকরা রাজ্য চালনায় এদেশের বুদ্ধিমানদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁদের আপিসগুলি যাতে অল্প ব্যয়ে চালানো যায় তাও ছিল তাঁদের কাম্য। এ অবস্থায় শহরবাসী অভিভাবকেরা দেখলেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সহজে চাকরি পেয়ে আরামে জীবনযাপন করবার প্রশস্ত পথ গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এটি যে জ্ঞান বিস্তারের প্রশস্ত পথ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশে শিক্ষিতের হার বিগত এক শতাব্দী যাবৎ কি হারে বেড়েছে তার হিসাব নিলে"।..."বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি করে।" —এই কথা আরও অনেক জায়গায় সত্যেন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন।

প্রতীচ্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে প্রাচ্যের সনাতনী বিদ্যার সঙ্গে মিশিয়ে এদেশে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ প্রমুখ যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতিকে তুচ্ছ করার কোন উপায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের যুগেইতো এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলা হরফ তৈরি করে নিজেদের ছাপাখানায় অনেক বই ছেপে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ সহজ করেছিলেন, বাংলায় বিজ্ঞান ও গণিতের বই প্রকাশিত হয়েছিল প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য। বিদ্যাসাগর সেইকাজে আরও অগ্রসর হয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগেই বাংলায় লেখা ডাক্তারী বইসহ প্রায় সকল বিষয়েই বাংলাভাষায় বই পাওয়া গেছিল। কিন্তু "শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের উপর দিল তাঁরা এর সুযোগ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন নি।" স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভেই জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল তবে "ইংরাজ শাসকেরা তখন ভাবছেন, তাঁদের প্রধান কর্তব্য হল ইংরাজী শিক্ষা মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমিত রাখা। এরাইতো সরকারী দপ্তরে চাকরী খুঁজবে। সমাজের অন্য স্তরের লোকেরা নিজেরাই ভাবুক নিজেদের সমস্যার কথা, যেভাবে চলতে চায় চলুক। ফলে গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিলাতী

শিক্ষার জন্য সুযোগের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাতে এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকুল। মুসলমান বেশির ভাগ মাদ্রাসা ও মক্তব ঘিরে বসে রইল। ব্রাহ্মণেরা আবার টোলের শিক্ষাও বজায় রাখতে চাইলেন। এঁরা ইংরাজী শিখতেন জাত বাঁচিয়ে—(যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায়) এবং মাথা গুনলে তাঁরাই বেশী হবেন।"—বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এদেশের শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ। ইংরাজ শাসনের প্রথম থেকেই এদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই কেমন করে শিক্ষা ও চাকরী সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, আর অবশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর বৃহত্তর জনসমাজ কিভাবে ঐসব ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে তার এক বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা। তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য তিনি প্রায় বিক্ষোভের সুরে বারে-বারেই বলেছেন ঃ

"স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতার যাকিছু সুফল তা যেন শুধু অল্প-সংখ্যক ইংরাজীভাষায় শিক্ষিতদের আয়ত্তের মধ্যেই না থাকে সেগুলি যেন দেশের সকল লোকের কাছে পৌঁছায়।

যাঁরা বলেন ইংরাজী যদি কম শেখান হয় তাহলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্যে দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে, চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাঁচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে—যেটা কেবলমাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবে সেইরকমই নীচের অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্ট-দায়ক।"

তাছাড়া গণতান্ত্রিক দেশে "সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকাল থাকবে কেন"—এ প্রশ্নও তুলেছেন। সেই সঙ্গে একেবারে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন—"দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের যেমন গর্ব করবার মত অনেক কথা আছে, তেমনি আমাদের দুঃখ করবার, লজ্জিত হবার কথাও আছে। এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে দেখা যাবে ইংরেজী শিক্ষিত গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ" এমনকি 'দেশভাগের কথা'কেও বলেছেন ঐ ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরই কাজ বলে। সত্যেন্দ্রনাথের মাতৃভাষা প্রবন্ধে এসব কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত।

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—"আজ আমরা কি নিজেদের বুকে হাত রেখে বলতে পারবো পূর্বপুরুষেরা যে সব কথা বলে গেছেন—তা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি? যেমন আমরা বলি সর্বভূতে সমদর্শন আমাদের ঐতিহ্য, এই থীসিসও জাহির করেছি আমাদের দেশে যে জাতিভেদ রয়েছে—এটিই পৃথিবীর সমস্যার একটা মস্তবড় সমীকরণ। একথা অনেকেই বলেন এবং অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক আছেন যাঁরা এ বিষয়টি খুব ভাল করে বোঝাবেন। তাঁরা করবেন চতুর্বর্ণের ওকালতি। সেই স্বর্ণযুগের কথা বলে আমরা বড়াই করি তবে সে সময় এ দেশে যে সব অনগ্রসর জাতি ছিল, তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহারের কথা সব সময় বলতে চাই না। যেমন রামরাজত্বে বেচারি অনার্য শম্বুককে বড়ই খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। আর্যরা যেসব জিনিস নিয়ে বড় হয়েছে, তপস্যা করে তিনিও সেসব পেতে চেয়েছিলেন। তার ফলে নাকি আর্যদের দেশে অনাবৃষ্টি হল এবং আর্যরা দেখলেন এমন লোককে বাঁচতে দেওয়া ঠিক হবে না। এতএব রামরাজত্বেও তাঁর মৃত্যুদণ্ড হলো।"—(1964 খৃষ্টাব্দে মহাজাতি সদনে তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিবসের ভাষণ)। আবার বিজ্ঞান কলেজের এক বিশেষ আলোচনা চক্রেও 1963 খৃষ্টাব্দে এদেশের শিক্ষাসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোচনায় শূদ্র শম্বুকের কথা তুলেছেন এবং বলেছেন "সত্যিকারের হিন্দুসমাজ পুষ্ট হচ্ছে লোকমুখে নানাভাবে পুরাণশাস্ত্র থেকে মানুষের উপভোগ্য যে সমস্ত আখ্যায়িকা দেশের মধ্যে চলিত আছে তারই উপর। আমরা উপনিষদের বাণী দিয়ে পুষ্ট নই" এ দেশের হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যগর্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ কয়জন মহাপুরুষ করেছেন? সত্যিকারের এদেশের বৃহত্তর অজ্ঞমুর্খ জনসমাজ বেদ-উপনিষদের কি বুঝে? তারা ঐ পুরাণশাস্ত্রের উপভোগ্য আখ্যায়িকা থেকে তৈরি করা যাত্রা, নাটক, লোকগীতি প্রভৃতি দিয়েই শাস্ত্রজ্ঞান ও সমাজচেতনা লাভ করে অন্ধ বিশ্বাস সংস্কারে সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে আসছে। তাই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (কটকে) মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনাকালে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন "আজ যারা বেশীরভাগ নিরক্ষর ও সামাজিক জাঁতার মধ্যে পড়ে চেপ্টে গিয়েছে তাদের চাঙ্গা করে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি নি।"

কেন এই একমত হতে পারছি না — সে উত্তরও ঐ ভাষণের মধ্যেই আছে "তারা (মানে ইংরাজী শিক্ষিতরা) ভেবে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের স্তরভেদ থাকবেই এবং উপরের স্তরে ইংরাজী জানালা দিয়ে যে জ্ঞান ঐ জানালা সমীপবর্তীদের উদ্ভাসিত করে তুলবে, তারই কিছু বুদ্ধিমানের মত নিম্নভাগে পরিবেশন করে নিজেদের স্বার্থবৃত্তি অনুযায়ী রাঙ্গিন করে নিয়ে বর্তমানে যে ধরনের স্তরবিন্যাস সমাজে আছে তা চিরন্তনী করে রাখতে পারবেন।"

সমগ্র দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান, মর্মস্পর্শী অনুভূতি এবং তার সামগ্রিক উন্নয়নে এমন প্রাণের আকুতি ও যথার্থ পথ নির্দেশ এদেশের কয়জন নেতা বা কয়জন মহা-মানবের মধ্যে পরিস্ফুট?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে অনুভব করতেন যে দেশের মূর্খ অশিক্ষিত বৃহত্তর জনগণকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক

উন্নতির কথা চিন্তা করা বাতুলতা। তাই বলেন "দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়; শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয় দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে।" এখানে এই শেষের কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বৃহত্তর জন সমাজ অশিক্ষার অন্ধকারে নিজেদের দুর্দশা লাঘবে ব্যর্থ হয়ে—ধর্মীয় দর্শন অনুযায়ী দীর্ঘকাল ভাগ্যবাদী জীবনযাপন করে চলার ফলেই—তাদের মনে সমগ্র দেশের প্রতি টান বা দেশাত্মবোধটা একেবারে স্তিমিত হয়ে গেছিল। তাই মুষ্টিমেয় বিদেশীদের আক্রমণে ভারত পর্যদুস্ত হয়ে দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করেছে। এদেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জনসাধারণ সেই বিদেশী আক্রমণের সময় কোন প্রতিরোধের চেষ্টাই করে নি। আজও সেই বৃহত্তর জনগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার করে একদিকে তাদের বাঁচার সুযোগ, ও সুখসমৃদ্ধির চেষ্টা, অন্যদিকে সমগ্র দেশ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে যদি সজাগ করা না যায়—তহলে এই বিশাল দেশের ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীনতা কি বিপন্ন হবে না?

"আমাদের তাই সেই সব রাস্তা দিয়েই যেতে হবে যে রাস্তা অনুসরণ করে অন্যান্য জাতিরা উন্নতির শিখরে উঠেছে।" বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখে এসে সত্যেন্দ্রনাথ (এবং রবীন্দ্রনাথও) অনুভব করেন এবং বলেন—মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেই জাপানী ও জার্মান জাত দুটি অতি তাড়াতাড়ি শিক্ষায়, শিল্পে, অর্থনীতিতে পৃথিবীর শীর্ষস্থানে উঠে গেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা নব্বইএর উপর। "এই রাস্তায় আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দেশের লোকের সকলের মনের মধ্যে বর্তমান যুগের যে প্রধান কথা তা পৌঁছে দিতে হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনোভাব এখন আর রাখলে চলবে না।"

এইভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞানচর্চা, এমনকি বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রও যে লেখা সম্ভব সেকথা তিনি প্রমাণ করে গেছেন "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার মাধ্যমে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান করে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক অনেকে লিখেছেন এবং লিখে চলেছেন, কিন্তু তিনি নিজে কেন এই জাতীয় কোন পাঠ্যপুস্তক বা বিশেষ কোন বিজ্ঞানের বই বাংলা ভাষায় লেখেন নি—এই রকম অনুযোগ প্রায় শোনা যায়। এই বিষয়ে তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য এবং বিজ্ঞান পরিষদের কর্মকর্তা ও অন্যান্য বহু কাজে সুদীর্ঘ দিন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসা স্বনামধন্য ডাঃ বৃন্দেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের লিখিত উক্তি—"অনেক সময় তাঁকে (সত্যেন্দ্রনাথকে) দেখেছি অক্লান্ত ভাবে সরস ও সাবলীল ভাষায় বহুক্ষণ ধরে শুধু সাধারণ কথাই নয়, এমনকি দুরূহ বিজ্ঞানের বিষয়ও বলে যেতে, কিন্তু সহজে তিনি কাগজের উপর কলম চালাতে চাইতেন না, কেবল আঁক কষার সময় ছাড়া। সে জন্যে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে, কি নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসাবে তাঁকে লিখিত ভাষণ পাঠ করতে দেখি নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় লোকের কাছে বলতে দেখেছি অক্লান্তভাবে, মাঝে মাঝে একটি শেষ হলে আর একটি সিগারেটের আগুন ধরাতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ক্ষান্ত হয়ে।" [সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ, 1974—শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে বৃন্দেন্দ্রকুমার পালের লেখা থেকে]। এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। তাছাড়া ধৈর্য ধরে লেখার মত বিশেষ সময় তাঁর ছিল কোথায়? অধ্যয়ন অধ্যাপনাসহ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর অনুসন্ধান আলোচনা এবং 'অবারিত দ্বার' বন্ধু-ছাত্র-আত্মীয়, অর্থী প্রার্থী সমাগমে সদাব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে, তাই তাঁর নিজস্ব লেখা অতি সীমিত এবং ভাষণগুলির অনুলিপি অনেক ক্ষেত্রে বহু কষ্টে সংগৃহীত। সেইগুলি একত্রিত করে তাঁর রচনা সংকলন। তবে এর বাইরেও আরও কিছু লেখা বা ভাষণাদির অনুলিপি আদি থাকা সম্ভব। তা সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও সহজ দক্ষতা নিয়ে কিছু লেখা এবং ভারতীয় দর্শন ও অতীত সংস্কৃতির উপর দক্ষতাপূর্ণ যে সব লেখা, আর বিজ্ঞানের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর যে সুচিন্তিত ভাষণ ও লেখাগুলি রচনা সংকলনে সন্নিবেশিত সেগুলির বিশদ আলোচনা এই অল্পপরিসরে সম্ভব নয়, তবে বিজ্ঞানের বাইরে বিদেশী ভাষায় (মূলত ফরাসী) লেখা কিছু কাহিনী ও গল্পের অনুবাদ যা এই রচনা সংকলনে প্রকাশিত—সেগুলির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ ঐ লেখাগুলি অনুবাদ করার পিছনে যে বিশেষ মানসিকতা কাজে করেছে তার প্রতিফলন ঐ অনুবাদগুলি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে।

তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "মাও-মালরো সংবাদ", 'মহাপাল কথা" ও "শেষের সাতদিন।"

ফ্রাঁসের বিদেশ মন্ত্রী এবং জেনারেল দ্য গলের বিশ্বস্ত দূত হিসাবে আঁদ্রে মালরো 1965 খৃস্টাব্দে চীনে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে দেখা করে যে সব আলোচনা করেছিলেন, তা প্রকাশ করার পর সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি 'মাও মালরো সংবাদ' হিসাবে তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন, এতে মাও সেতুং-এর কিছু কাহিনী ও সেদিনের চীনের অবস্থাটা একটা বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে। চীন ও মাও সে তুং সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের বিশেষ মনের খোরাক জোগাবে। 'মহাপাল কথা' হিব্রু লেখক সামুয়েল যোসেফ আগনন্। 1959 খৃস্টাব্দে ইহুদীদের সমস্যা সামনে রেখে এই গল্পের অবতারণা। সেখানকার সমাজ জীবনে রাজনীতির খেলার সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্যারও বেশ কিছু মিল আছে মনে করেই সত্যেন্দ্রনাথ এটি অনুবাদ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ চেতনা

রতনমোহন খাঁ*

মাঝে মাঝে কতিপয় মানুষের আদর্শে, চিন্তায় ও কাজে দেশ বা জাতি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয়, বহু বর্ষের গতানুগতিকতায় ছেদ পড়ে, জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হয়, অবাঞ্ছিত অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিক নিয়মের অচলায়তনের ভিত কেঁপে উঠে। সত্যেন্দ্রনাথ এরূপ একজন বিরল মানুষ, নানা গুণের একত্র সমাবেশে পরিপূর্ণতার প্রতীক। বহু খ্যাতনামা মানুষের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভেদ হলো, তিনি ছিলেন অল্পপ্রচারবিমুখ এবং খ্যাতি, যশ ও সম্মানে উদাসীন। ফলে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাই অজানার তিমিরে। এ অবস্থায় তাঁর জীবন-আলেখ্য থেকে সমাজ চেতনার চিত্র অঙ্কন অপূর্ণতার দোষে দুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম 1894 খৃস্টাব্দে 1লা জানুয়ারী এবং মৃত্যু 1974 খৃস্টাব্দের 4ঠা ফেব্রুয়ারী। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। পরিবর্তন ঘটেছে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, সামাজিক কাঠামোতে। ঐ সময় আমাদের দেশে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত তরুণ সমাজের এক মন ও এক লক্ষ্য—পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। এরূপ যুগসন্ধিক্ষণে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের শুরু। সহপাঠী তৎকালীন ছাত্রসমাজ তাই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে প্রায় প্রত্যেকে সরকারী উচ্চপদ ও অর্থের মোহ ত্যাগ করে শিক্ষা বিস্তার এবং বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও গবেষণার মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এরূপ পটভূমিতে যে যাত্রা হয়েছিল শুরু তা কেবল ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যে আবদ্ধ না থেকে স্বাধীনতার আগে ও পরে জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের স্বীকৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে।

জাতীয়তাবোধ—1905 খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গ আইন পাশ করান। সারা ভারত প্রতিবাদে হয়ে উঠে মুখর। দেশ নেতাদের ডাকে বারো বছরের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথও বিদেশী পণ্য বয়কট ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্নি-সংযোগ আন্দোলনে নেমে পড়েন। জীবনতারা হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ একসঙ্গে ছাত্র-জীবনে অনুশীলন সমিতির নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। ঐ সমিতি পরিচালিত একটি নৈশ বিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্নাতক হওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস নিতেন। শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরাই ছিল ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। জাতীয়তাবাদের দীক্ষা তাঁর অন্তরে যে কিরূপ রেখাপাত করেছিল তা একটি সামান্য ঘটনা থেকেই বুঝা যায়। 1914 খৃস্টাব্দে ইংরাজ অধ্যাপক হ্যারিসন প্রেসিডেন্সী কলেজ দ্বিতীয় বর্ষের একটি ছাত্রকে অকারণে অপমান করায় কলেজের ছাত্ররা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে এবং এই লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানায়। ইংরাজ শাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন এবং অধ্যাপক হ্যারিসন নতি স্বীকার করেন। এটি সুভাষচন্দ্র ও ওটেন সাহেবের বহু আগের ঘটনা। এই জাতীয়তাবোধ তাঁর জীবনে কোনদিন ম্লান হয় নি। কর্মজীবনে দুঃস্থের সাহায্যে, আর্তের সেবায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণের কাজে এগিয়ে এসেছেন সবার আগে শত বিপদকে তুচ্ছ করেও। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও দেশের উন্নয়নের জন্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করাকে হেয় মনে করতেন না। তাই মেঘনাদ সাহা যখন 1952 খৃস্টাব্দে কলিকাতার একটি কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য প্রার্থী হন, তখন তাঁর প্রচার পত্রে তিনিই প্রথম স্বাক্ষর করেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার কারণ হিসাবে ডঃ সাহা বলেছিলেন—"অনেক সময় অনুযোগ করা হয় যে বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁদের গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও বাইরের জগতে কি ঘটছে তাতে অংশ নিতে তাঁরা বিমুখ। সমাজের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ বা সহায্য আসে না। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি আমি আমার জীবনের অনেকটা অংশ দেশ ও জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেস ও অন্য দলগুলি দেশের আর্থিক, সামাজিক দুর্গতি দূর করার বিষয়গুলি ভেবে দেখার সুযোগ পায় নি।

[31 পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আর "শেষের সাতদিন" হচ্ছে মহান টলস্টয়ের জীবনের শেষ সাতদিনের কথা। যে পারিবারিক অশান্তি নিয়ে এই মর্মস্পর্শী সাতদিনের কথা তা থেকে একটি বিশেষ জীবনদর্শন বলিষ্ঠভাবে প্রতিভাত।

এই অনুবাদ লেখাগুলি যেকোন সাধারণ পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে আছে "রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ" সম্পর্কে রোলাঁর ডাইরী থেকে আকর্ষণীয় অনুবাদ কাহিনী, আর "জাহাজডুবি" নামক এক মর্মস্পর্শী বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অসামান্য দক্ষতা—তাঁর রচনা সমূহে পরিস্ফুট। বিজ্ঞানের বিষয় সমূহকে এভাবে ভাষায় রূপ দেওয়া কি যে কঠিন তা যাঁরা লেখেন বা লিখতে চেষ্টা করছেন তাঁরাই বুঝবেন। বাংলা সাহিত্যের ধারায় এ এক বিশেষ অবদান যাকে বিজ্ঞান-সাহিত্য রূপে আখ্যায়িত করা উচিৎ। বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাশৈলী এক বিশেষ বৈঠকী ঢঙে সাজান। যেন কোন মজলিসী বৈঠকে গল্প বলে চলেছেন। ভাবপ্রকাশের এই বিশেষ ধারাটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে আচার্য সত্যেন বোস তাই অনবদ্য, অসামান্য।

---

* ব্লক-6, ফ্ল্যাট নং-71, 10 গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 003

কিন্তু এগুলি সমাজের জীবন-মরণ সমস্যা। যদি আমরা সমস্ত নাগরিকের খাওয়া, পরা, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকুরীর সুব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন।" দুই বন্ধুর মধ্যে এখানে কোন মতবিরোধ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথও ঐ বছরই রাজ্যসভায় মনোনীত হন। 1958 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন।

বিজ্ঞান চর্চার মূল হেতু দেশসেবা—দেশকে উন্নত করতে হলে, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য চাই বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এই মনোভাব নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক কয়েকজন তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে তারুণ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে স্বল্প মাহিনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগকে আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে ব্রতী হন। 1916 খৃস্টাব্দে সত্যেন্দ্র নাথ ও মেঘনাদ ফলিত গণিত বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরেই উভয়ে চলে আসেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। এরপর 1921 খৃস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ চলে আসেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে। এখানেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণা-পত্র, যেটি 1924 খৃস্টাব্দে জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র কাজ, যা বোস সংখ্যায়ন নামে পরিচিত, তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐ কাজকে ভিত্তি করে, বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর তত্ত্ব সমাজের বহু কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে তাঁর অভিমত 'সপ্ততিতম জন্মদিবসে' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে—'দেশকে বুঝতে, দেশের সব সমস্যা জানতে, এ-দেশের মানুষের দুঃখের কারণ খুঁজতে এবং অন্য দেশে মানুষের জন্য মানুষ কি করছে—তার পরিচয় পেতে যেমন এক হিসাবে চাই সাহিত্যে প্রবেশ লাভ, তেমনি চাই বিজ্ঞানের চর্চা। তার মাধ্যমে জানবে মানুষ কতটুকু কি করতে পারে সেই মানুষের দুঃখ দূর করতে। বিজ্ঞানের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।'

ভারতীয় ঋষির মত সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী। বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে দেশের সেবায় সমর্পিত প্রাণ হলেও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডঃ সাহা, হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মত গবেষক গোষ্ঠী, গবেষণা কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন নি বা কোন বৃহৎ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার স্থপতি হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনামাফিক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ হলেও বাংলার গবেষণা কেন্দ্রগুলি, শিক্ষা কেন্দ্রগুলির এমনকি বাঙালীর যে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিই ছিল তাঁর কাম্য। বাঙালীর সুখ-দুঃখ নিয়েই তাঁর হৃদয় ভরে থাকত। এ কারণেই 1973 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"স্বদেশী যুগের প্রথমে যেসব কলকারখানা খোলা হয়েছিল তার প্রায় সবই একে একে বন্ধ হতে বসেছে, নয় অন্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। বাঙালীর গর্ব করার মত বাঙালীর প্রতিষ্ঠান বলে যা বলা যায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরক্ষরতা দূরের কাজে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তারে আমরা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছি।"

বিজ্ঞান আন্দোলন—মাতৃভাষায় শিক্ষা ছাড়া গণশিক্ষা সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি আক্ষরিক না হয়, জ্ঞানের আলোয় নিজেদের অন্তরকে আলোকিত করতে না পারে তবে প্রশাসনিক হাজার চেষ্টাতেও দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও পঠন-পাঠনের জন্য ব্যাপকভাবে, সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্বের পুরোধা ও পথপ্রদর্শক হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এই আন্দোলনে তিনি যে বিপুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় 'কথা প্রসঙ্গে প্রবন্ধে'। "আমাদের বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের চর্চা করা উচিত, রবীন্দ্রনাথ কতদিন আগে বলে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মন কি নড়াতে পারা গিয়েছে? তোমরাই জানো, আমি তো চিরকাল বেঁচে থাকব না, অবশ্য আমাকে লোকে বলে ঐ একটি লোক আছে—আর কেউ চায় না, আর রবীন্দ্রনাথ চাইতেন। তিনি তো কবি মানুষ, তিনি তো বোঝেন না—বৈজ্ঞানিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি হতে গেলে বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখা, মানে তার সঙ্গে সঙ্গে সে যা ভাষা বলবে—সেই বুলি কাটা এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি তা আসে তো সে কথাটাই আবার যথাসম্ভব সেই ভাষাতেই উত্তর দেওয়া, এই হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের প্রধান নিরিখ।"

আচার-ব্যবহারে, কাজে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী ও মনে-প্রাণে আদর্শ বিজ্ঞান সাধক। বহু দেশ ঘুরে সত্যেন্দ্রনাথ নিজ দেশেও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হন। বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের জন্য, বিজ্ঞান মান-সিকতা গঠনের জন্য, তাঁর বহুদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 1947 খৃস্টাব্দে 18ই অক্টোবর বিজ্ঞান কলেজে কয়েকজন বিজ্ঞান অনুরাগীর সভা হয় তাঁরই সভাপতিত্বে। সভায় স্থির হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ঠিক হয় 1948 খৃস্টাব্দে 25শে জানুয়ারী। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
92, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-9

বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমন

ভাবে চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিত ভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এই প্রধান বাধা দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই। গত 18ই অক্টোবর (1947) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" স্থাপনা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা।

তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশকরা।

চতুর্থতঃ লোক সাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধশালী করে তোলা।

পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার জন্য। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষতঃ আমরা আশা করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য, কারণ আমরা সবাই এই মহান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতা, আমরা আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়'।

আমাদের সঙ্কল্পকে রূপদান করার জন্য স্থির হয়েছে আগামী 25 জানুয়ারী, 1948 এই প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকক্রমে স্থাপন হবে। সুধীবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন।

নাম ও ঠিকনাসহ চাঁদা (বাৎসরিক 10 টাকা), পাঠাবার স্থান : ডঃ সুবোধনাথ বাগচী, কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 92 আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—9

সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
জগন্নাথ গুপ্ত	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী	পরিমল গোস্বামী
সর্বাণীসহায় গুহসরকার	অমিয়কুমার ঘোষ
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সুধাময় মুখোপাধ্যায়
সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী	দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	

প্রতিষ্ঠা দিবসেই পরিষদের মুখপত্র হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত না হলেও, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হয়েছে, সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান জানার কৌতূহল বেড়েছে ও জানার সুযোগ এসেছে, বিজ্ঞানের যে কোন দুরূহ বিষয়কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যে সম্ভব এই বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু উচ্চস্তরে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন এখনো সম্ভব হয়নি, বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে উঠে নি।

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান পরিষদকে নিজ কন্যার মত লালন করেছেন, কিন্তু সাময়িকভাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটান ছাড়া পরিষদের জন্য আর কিছু করে যেতে পারেন নি। তার স্থায়িত্ব বজায় রাখার দায়দায়িত্ব দেশবাসীর হাতে অর্পণ করে গেছেন। অবশ্য পুরোপুরি বাংলাভাষা চালু ব্যাপারে অনেক সমস্যা আছে। এ সবের কিছু উল্লেখ আছে "বাংলাভাষা চালু ব্যাপারে" শীর্ষক প্রবন্ধে। সামান্য উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো—"শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগ ও প্রচারে এই প্রয়াসটি একান্তভাবে শিক্ষা বিভাগের দায় ও দায়িত্ব বলে গণ্য না করলে এবং সরকারী ও বেসরকারী দৈনন্দিন ব্যবহারে ব্যাপক ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষাকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতনভাবে একই সঙ্গে চেষ্টা না করলে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থী যদি তার পারিপার্শ্বিক জগতে নিয়ত দেখে যে ইংরেজীনবীশের বাজার দর বাঙলানবীশের তুলনায় অনেকগুণ বেশী, তাহলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সে বা তার অভিভাবকরা—ইংরেজীর দিকে ঝুঁকবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পরিপার্শ্বিকের এই প্রতিকূল ও বিভ্রান্তিকর প্রভাবকে দূর না করা অবধি মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না।"

জাতীয় সংহতির প্রয়াস—স্বাধীনতা লাভের ছত্রিশ বছর পরেও ভারত অনুন্নত দেশ, জাতীয় সংহতি বিপন্ন, প্রাদেশিকতা ধর্মান্ধতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রমশঃই উগ্ররূপ নিচ্ছে। এর কারণ রাষ্ট্রীয় নেতাদের অদূরদর্শিতা, শিক্ষা প্রকল্পে অসম্পূর্ণতা

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে নিষ্ক্রিয়তা। ভারত বহুভাষী দেশ। বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষাদান ভারতীয় সংহতির পরিপন্থী নয়—একথা সত্যেন্দ্রনাথ বারে বারে ব্যক্ত করেছেন।

"ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলে তার ফলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল' (academic mobility) ব্যাহত হবে এবং তার দরুণ উগ্র প্রাদেশিকতার একমাত্র প্রতিষেধক চিন্তা ও আদর্শের অবাধ লেনদেনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। অনেকেই এখন সাহসে ভর করে বলছেন যে, আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খল স্খলিত হলেও তা ইংরেজী ভাষার স্বর্ণসূত্রটিকে পিছনে রেখে গেছে, যা নাকি আমাদের সংহতির স্বপক্ষেই কাজ করছে ও সহায়তা করেছে আমাদের আত্মার পুনরাবিষ্কারে। এই সব লোক এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় আদর্শেই বিশ্বাসী।" —শিক্ষা ও বিজ্ঞান

"ইংরেজী যে দেশের ঐক্যের কারণ তা নয়। একতার কারণ আমাদের নিজেদের মনের মিল। আমরা যদি দরদী হই তাহলে বিদেশী ভাষাভাষীদেরও আমরা আপন করে নিতে পারি, অপর পক্ষে আমাদের মনের মধ্যে যদি ভ্রাতৃবোধ না থাকে তা হলে পাকিস্তান হতে বেশি দেরী হয় না।" —মাতৃভাষা

"মনে যদি থাকে ভালবাসা, তাহলে ভাষার অসুবিধা থাকলেও মানসিক যে মিল সেটা রাখতে অসুবিধা হয় না।" —মাতৃভাষা

ইংরাজী রোখো আন্দোলনকারীরা বা উগ্র হিন্দীপন্থীরা এখান থেকে নিশ্চয়ই কিছুটা শিক্ষা পাবেন। জাতীয় সংহতির জন্য কি করা উচিত সে নিয়েও তিনি চিন্তাভাবনা করেছেন।

"আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশ মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে।" —শিক্ষা ও বিজ্ঞান

"ঐক্যানুভূতিকে জাগিয়ে রাখা সাধনা বিশেষ। মুখের কথায় ঐক্য হবে না।"

"এই সাধনার পথ কি? আমার মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিজেদের ভাষার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের ঐতিহ্য কি এবং কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল।" —মাতৃভাষা

মাতৃভাষার মাধ্যমে দরদী মন নিয়ে সকলকে শিক্ষিত করে তুললে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি না হয়ে বিচ্ছিন্ন মনোভাব দূর হয়ে কেবলমাত্র ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে মানবজাতি একত্র হয়ে একটা মহামানব সমাজ গড়ে উঠবে।

ধর্ম সম্পর্কে—ভারতীয় দর্শন ও ধর্মকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে তাঁর মত হলো।

"নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত—যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ—তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তি বিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু-দিনের পন্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরণের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এজগৎ দু-দিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।"

— শিক্ষা ও বিজ্ঞান

যা করা উচিত তা হলো—

"ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ-পরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং দারিদ্র, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু ওই সব প্রয়াস দেশের ও জগতের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে এইটাই হচ্ছে আসল কথা।" শিক্ষা ও বিজ্ঞান

"জ্যোতিষশাস্ত্র, জন্মান্তরবাদ, জাতিভেদ ভারতকে করেছে পঙ্গু। পরপর জন্মে একটি মানুষের জীবনে যা ঘটবে তা যদি আগে থেকে কপালে লেখা থাকে, তাহলে আর কাজ করার প্রবণতা থাকবে কেন? ধর্মধ্বজীরা নিজেদের বা এক শ্রেণীর স্বার্থকেই বড় করে দেখে। ভারতে ধর্ম কোনদিনই সকলকে এক পংক্তিতে বসার অধিকার দেয় নি। রামরাজত্বেও অনার্য শম্বুক আর্যদের সমান হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। ধর্ম নিয়ে যত কম মাতামাতি হবে ততই দেশের মঙ্গল।"

বিশ্ব শান্তির দরবারে—কেবলমাত্র তত্ত্বীয় জ্ঞান হিসাবে যে অনুসিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছিলেন, সেই অনুসিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে তাঁরই জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করায় মত সাংঘাতিক মারণাস্ত্র তৈরি হবে, একথা আইনস্টাইন কোনদিন কল্পনাই করেন নি। বিজ্ঞান মানবকল্যাণে নিয়োজিত হবে এই ছিল তাঁর আজন্ম বিশ্বাস। হিরোসিমা নাগাসাকির ধ্বংসকাণ্ডে তিনি হয়েছিলেন বিমূঢ়, আত্মধিক্কারে তাঁর দেহ হয়েছিল শীর্ণ। তারপরেই তিনি পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সচেষ্ট হন। দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লিখিত খসড়ার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন।

(শেষ অংশ 36 পৃষ্ঠায় দেখ—

প্রফেসর সত্যেন বোস

তপেন রায়*

শরৎ চাটুজ্যে, সত্যেন বোস আর কাজি নজরুল এই তিনজনেই বাঙ্গালীর একান্ত আপনজন। এর মধ্যে সত্যেন বোস একজন বিখ্যাত এবং বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। সত্যেন বোস একজন ফিজিসিস্ট বা পদার্থবিদ। পদার্থবিদ্যায় খুব উন্নত মানের কাজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন, যাঁদের আমরা নামকরা পদার্থবিদ্‌দের পর্যায়ে ফেলি। কিন্তু নিউটন, আইনস্টাইন, ম্যাক্সওয়েল, ডিরাক, ফার্মি এ'রা এমন ধরনের ফিজিসিস্ট যাঁদের কাউকে বাদ দিলে ফিজিক্সটার একটা অংশ বাদ পড়ে যাবে অর্থাৎ ফিজিক্স বোঝার ব্যাপারটা আটকে যাবে। সে রকম বোস ব্যতিরেকে স্ট্যাটিসটিক্যাল ফিজিক্স এবং পুরো মডার্ন ফিজিক্সটাই বাদ পড়ে যাবে। বোসন কথাটা আজকাল অত্যন্ত ঘরোয়া কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোসন-এর সঙ্গে আর একটা নামও বলতে হয় সেটা হল ফার্মিয়ন। সমস্ত দুনিয়ার যত রকমারী কণিকা আছে তাদের দু-ভাগে ভাগ করা হয় এক দলকে বলা হয় বোসন এবং অন্যদের বলা হয় ফার্মিয়ন। বোসন-কথাটা বোস থেকেই উৎপত্তি। প্রফেসর বোস আলোর কণাদের জন্য প্রথম তাঁর ঐ বোস-স্ট্যাটিসটিক্স উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ফিল্ড থিওরি এবং বর্তমানে পার্টিক্‌ল্ ফিজিক্স-এর একটা প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যেন বোস বোস-স্ট্যাটিসটিক্স ছাড়াও বহু বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড থিওরির একটা খুব দরকারী গাণিতিক সমাধান করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড থিওরির কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন। আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের একীকরণ করবার বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু প্রফেসর বোস মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ঘটনা ও মেসন কণিকাদের বিষয়বস্তু এই সকলেরই একীকরণ করেছিলেন প্রফেসর বোস রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা বাদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রফেসর নিখিলরঞ্জন সেন যিনি আপেক্ষিকতাবাদে প্রচুর কাজ করেছেন একবার প্রঃ বোসের কাছে একটা নতুন সমাধান নিয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন "সত্যেন দেখ আমি একটা নতুন সলিউশন করেছি" ইত্যাদি। প্রঃ বোস সলিউশনটাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখে এবং কিছু অঙ্ক কষে প্রচণ্ড হাসতে হাসতে বল্লেন "তোর সলিউশনটা মোটেই নতুন নয়; আইনস্টাইনের ইকোয়েশানের পাউলির সলিউশনের রূপান্তর মাত্র" —নিখিল সেন প্রঃ বোসের দেখান অঙ্কটার খুব রসগ্রহণ করলেন। নিখিল সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাপ্লায়েড ম্যাথেম্যাটিক্স-এর হেড বা প্রধান ছিলেন। সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, নিখিল সেন সকলেই সহপাঠী।

সত্যেন বোস ফিজিক্সের এমন এমন আবিষ্কার করেছিলেন যে গুলোর প্রমাণ করা যায় নি—এমপিরিক্যাল। যেমন উনি দেখালেন যে পিরিয়ডিক টেবলের যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ দুষ্প্রাপ্য তাদের এ্যাটমিক নাম্বারের বর্গ যথাক্রমে 1×1840, 2×1840, 3×1840 ইত্যাদি হবে। সাংঘাতিক ব্যাপার—এখানে বলা দরকার $1840=$প্রোটনের ভর $\div$ ইলেকট্রনের ভর। এরকম বহু তথ্য প্রঃ বোসের জানা ছিল যেগুলো উনি ওঁর ছাত্রদের দেখিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলোর পেপার পাবলিশ করেন নি।

একবার আমি প্রঃ বোসের বাড়ীতে বসে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা গাণিতিক সমাধান দেখছি—প্রফেসর বোস দেখাচ্ছেন, সেই সময়ে ওঁর এক নাতি এসে বলল দাদু এই অঙ্কটা করে দাও। সেটা জ্যামিতির একটা সম্পাদ্য। আসলে একটা বিশেষ ধরনের বলে স্কুলে ঐ সম্পাদ্যটা করা যায়। মাস্টারমশাই (আমরা প্রঃ বোসকে মাস্টারমশাই বলতাম) অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন কোনও সুবিধে করতে পারছেন না তখন ঐ বিচ্ছু দাদুর দিকে একটু কটাক্ষ করে দৌড়ে স্কুল যাবার জন্য তৈরি হতে গেল। পরের দিন মাস্টারমশাই সকালে কলেজে এসেই আমায় ডেকে পাঠালেন—বললেন—"বুঝলি কাল ঐ অঙ্কটার solution-টা করে বিমল আনন্দ হল" "বলে উনি process-টা বললেন। ঐ ধরণের যত রকম problem হয় তার general solution টা inversion technique ব্যবহার করে উনি গাণিতিক একটা অতি মনোজ্ঞ solution করেছেন। বি-ম-ল আনন্দ হওয়ারই কথা। দিনরাত পরিশ্রম করে সাহেবের (মাস্টার মশাই এ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে সাহেব বলতেন) Unified Theory-র চৌষট্টি ইকোয়েশানের general solution (Tensor

---

35 পৃষ্ঠার পরের অংশ

আইনস্টাইন এই খসড়ায় সই করেন—মৃত্যুর দুদিন আগে। 1958 খৃস্টাব্দে 20 সেপ্টেম্বর পাগ্‌ওয়াশ সম্মেলনে গৃহীত হয় ভিয়েনা ঘোষণাপত্র। এতে স্বাক্ষর করে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ঐক্যমত গড়ে তুলতে মানবদরদী সত্যেন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছেন সুইডেন, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। 1962 খৃস্টাব্দে অগাস্ট মাসে যান জাপানে বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর এক আলোচনা সভায়। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে 1945 খৃস্টাব্দে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের স্মৃতিতে এই সভা আয়োজিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ, দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ, মানবপ্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথের নবইতম জন্মবর্ষে তাঁর সমাজচেতনার প্রয়াসগুলি বাস্তবায়িত করাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

---

* বিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-700 032

Solution) করেছিলেন। solutionটা বুঝতে পারলে মনে হবে "বটে, বটে বাঘের বাচ্চা।"।

পড়াবার সময়ে যতক্ষণ না উনি ব্যাপারটা ও'র নিজের মনের মতো করে বলতে পারতেন ততক্ষণ দারুণ অস্বস্তিবোধ করতেন। প্রফেসর শিশিরেন্দু গুপ্ত (I. I. T.—Head of the Dept. of Physics) একবার ও'কে এসে বললেন যে Quantum Electrodynamics (ও'র এবং পৃথিবীর মাথা মাথা ফিজিসিস্টদের প্রাণের subject)-এর divergence difficulty-র সমাধান হয়ে গেছে। উনি সমাধান খুব মন দিয়ে শুনলেন এবং একটু চুপ করে থেকে বললেন—"ওরে এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়াল ডাকছে"।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্যার এক পথিকৃৎ প্রফেসর পল আঁদ্রে মরিস্ ডিরাক প্রফেসর বোসকে খুবই ভালবাসতেন এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ডঃ নরেশ সেনগুপ্তর দুহিতা শ্রীমতী ডঃ পূর্ণিমা সেনগুপ্তা বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিত সিন্হার স্ত্রী। ঐ পূর্ণিমা সিন্হাকে প্রফেসর ডিরাক খুবই স্নেহ করতেন কারণ প্রফেসর বোস পূর্ণিমাকে নিজের মেয়ের চেয়েও বোধ হয় বেশী স্নেহ করতেন। পূর্ণিমা প্রফেসর বোসের রিসার্চ-এর ছাত্রী এবং ওঁরই কাছে ডক্টরেট X-rayতে exprimental work করে। প্রঃ মহাদেব দত্ত প্রঃ বোসের ছাত্র এবং উনিও একটা নতুন ধরনের statistics করে doctorate পেয়েছিলেন। তার নাম Dutta-Bagchi Statistics. Chemistry-র Hosseman ঐ Statistics-কে দারুণ কাজের বলে মন্তব্য করেছেন এবং Hosseman তাঁর chemistry-র problem-এ কাজে লাগিয়েছেন। এই সুবোধ বাগচী খুব মজার লোক। উনি chemistry-র লোক কিন্তু Mathematics করতে দারুণ ভালবাসেন। অশোকদা Prof Bose-এর ছাত্র Physics-এর। বর্তমানে Canada-তে University Professor of Mathematics.

Prof. Bose-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বহু অদ্ভুত ধরনের মনোবৃত্তির students ছিল। প্রফেসর বোসের অঙ্কের ব্যাপারে সিদ্ধিদাতা গণেশ ছিলেন আমারও মাস্টার মশাই শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ। একজন দুর্ধর্ষ Theoretical Physicist, prof Bose-এর ছাত্র এবং admirer ডঃ সুধাংশু দত্তমজুমদার। উনি মাঝে মাঝে বলতেন —'আরে ঐ solution টাতো prof Bose আমার কাছে চাঁটা খেয়ে তবে ঠিক ঠিক করলেন। অবশ্য উনি অনেক International Physicist-কেই চাঁটা মেরেছেন (ওঁর ভাষায়)।

ঢাকা থেকে B.Sc. পাশ করে রতন ব্রহ্মচারী ওঁর কাছে এল relativity তে কাজ করতে এবং Germany-তেও গিয়েছিল। বর্তমানে উনি Internationally famed Life scientist. আর এক জনের সম্বন্ধে বলতেই হয়—ডঃ পূর্ণেংশু রায়, প্রঃ বোসের ছাত্র কিন্তু Abdus Salam-এর কাছে doctorate. উনি বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন Theoretical Phyiscs—এ-কাজ করেছেন। প্রঃ বোসের ছাত্র ডঃ জগদীশ শর্মা বর্তমানে American Defence-এর Scientist. ডঃ শিব ভট্টাচার্য্য Head of the Dept. of Physics C.U. হয়েছিলেন, X-ray-তে কাজ। প্রফেসর বোস যদিও প্রধানতঃ তাত্ত্বিক গবেষণা করতেন কিন্তু experiment সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। যেমন ঢাকাতে থাকতে উনিই প্রথম মিস্ত্রিদের design বলে এবং Process workshop থেকে Weisenberg camera তৈরি করিয়েছিলেন X-ray-র কাজের জন্যে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Thermoluminescence গবেষণার জন্য একটা যন্ত্র তৈরি করিয়েছিলেন নিজের মতলবে। Thermoluminesence spectrum বোঝবার এবং Record করার জন্য। ঐ যন্ত্র ঐ সময়ে Paris Conference ভুয়সী প্রসংশিত হয়। নক্সাটি প্রচ্ছদে দ্রষ্টব্য।

সকলের একদিন না একদিন তিরোধান হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রফেসর বোসের তিরোধানে স্কুল লেভেল থেকে গবেষণার পর্যায় পর্যন্ত যে বিচিত্র চিন্তাধারা ও সমস্যার মনোজ্ঞ সমাধান একজনের কাছ থেকে অনেক ধরণের Linkage-এ পাওয়া যেত সেটা আর ভাবাই যাবে না। Physics শেখা যে কত গভীর এবং কত আরামের ও মজার সেটা আমরা মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি এবং এরকম একটা দিনও আমার চোখে পড়ে নি যে মাস্টারমশাই Physics ঘটিত কোন ঘটনার একটা নতুন ধরনের কিছু না দেখাচ্ছেন।

প্রঃ বোসের কাছে পড়াশুনো করার মুস্কিলটা হল—কোনও জিনিষ বুঝতে পারা মানে যে ধরনের তলিয়ে বুঝতে হয় সেটার পরিশ্রম প্রচণ্ড এবং তার সঙ্গে অন্যান্য শাখা প্রশাখার সম্বন্ধ সব অনুধাবন করতে হয়। এক কথায় প্রফেসর বোস শুধু একজন Giant Physicist-ই নন, তিনি ছিলেন আদর্শ মাস্টারমশাই। যেমন Arnold Sommerfeld.

"যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

List of scientific papers by Professor S. N. Bose

1. On the influence of the finite volume of Molecules on the equation of State, Phil. Mag., 36,1918, 199 with M. N. Saha.
2. The Stress-equations of Equilibrium, Bull. Cal. Math. Soc. 10, 1919, 117.
3. On the Horpolhode, Bull. Cal. Math, Soc. 11, 1919,21.
4. On the equation of State, Phil. Mag., Sr. 6, 3[illegible], 1920, 456 with Meghnad Saha.
5. On the deduction of Rydberg's law from the quantum theory of Spectral Emission, Phil. Mag., 40, 1920, 619.
6. Plancksgesetz and Lichtquantenhypothese Zei s. für. Physik, Bd 26, 1924, 178.
7. Warmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie, Zeits. für, Physik, Bd. 27, 1924, 384.
8. On the complete moment-coefficients of the D^2-statiscs Sankhya ; The Indian Journal of Statistics, 2, 1936, 385.
9. On the moment coefficients of the D^2-statistic and certain integral and differential equations connected with the multivariate normal population, Sankhya : The Indian Journal of Statistics, 3, 1937, 105.
10. Recent progress in Nuclear Physics, Science and Culture, 2, 1937, 473.
11. Anomalous Dielectric Constant of Artificial Ionosphere, Science and Culture, 3, 1937, 335 with S. R. Khastgir.
12. On the total Reflection of Electromagnetic waves in the Ionosphere, Ind. Jour. Phys. 12, 1938, 121.
13. Studies in Lorentz Group, Bull, Cal. Math. Soc., 31, 1939, 137.
14. The complete solution of the Equation : $\nabla^2\phi - \frac{\partial^2\phi}{c^2\partial t^2} - K^2\phi = -4\pi\rho\ (xyzt)$ proc. Nat. Inst. Sc., India, 7, 1941, 93 with S. C. Kar.
15. Reaction of sulphonazides with Pyridine : Salts and Derivatives of Pyridine-imine, Science and Culture, 8, 1943, 48 with P. K. Dutta.
16. A note on Dirac equations and the Zeeman effect, Ind. Jour Phys. 17, 1943, 302 with K. Basu.
17. On an integral equation associated with the equation for hydrogen atom, Bull. Cal. Math. Soc. 37, 1945, 51.
18. Extraction of Germanium from Sphalerite collected from Nepal Part II, Jour. Sci. Indust. Res. 9B, 1950, 271.
19. Les identi ies de divergence dans la nouvelle theoric unitaire, Comptes rendus des Seances de la Academic des Sciences ; t, 236, 1953,1333.
20. Une theorie du champ unitaire avec $\Gamma\mu=0$ Le Jour. de physique et la Radium, t 14, 1953, 641.
21. Certaines consequences de l'existence du tenseur g dans le champ affine relativiste. Le Jour. de physique et la Radium. t 14, 1953, 645.
22. The affine connection in Einstein's new Unitary field theory, Annals of Math. 59, 1954, 171.
23. A report on the study of Thermoluminescence, Dr. D. M. Bose Seventieth Birthday Commemoration Volume : Tran. Bose Res. Inst. 20, 1955, 177.
24. Solution d'une equation tensorielle intervant dans the'orie du champ unitaire, Bull, Soc. Math. France 83, 1955, 81.

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(জীবনের প্রথম দিক)

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়*

"আপনি একি করেছেন, গণিতের পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে 110 দিয়েছেন ছেলেটিকে ?" —"আমি ঠিকই করেছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে ছাত্র প্রশ্নপত্রের একটি বিকল্প প্রশ্নও বাদ না দিয়ে নির্ভুল উত্তর দিতে পারে তার ঐ রকম নম্বর পাওয়া উচিত।"

বিস্মিত এবং অপ্রসন্ন হেডমাস্টার মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলেন গণিত শিক্ষক।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার সেরা বিদ্যালয় "হিন্দু স্কুল"। সে যুগের প্রবাদ পুরুষ উপেন্দ্রনাথ বক্সী ছিলেন হিন্দু স্কুলের গণিত শিক্ষক এবং যে অদ্ভুত মেধাবী ছাত্রটিকে কেন্দ্র করে উপরিউক্ত কথোপকথন সে হল পরবর্তীকালে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বর্তমান ভারতের বিজ্ঞান গগনের একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শুধু টেস্ট পরীক্ষায় ঐ কৃতিত্বের ভিত্তিতেই নয়, ছাত্র সত্যেনের মেধার পূর্ণ পরিচয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বলেই উপেন্দ্রবাবু সোৎসাহে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সত্যেন একদিন লাপ্লাস বা কোচির মত ধুরন্ধর গণিতজ্ঞ হবে।

গণিতের প্রতি পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসুর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তিনি ছিলেন একজন কৃতী একাউন্ট্যান্ট এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলকাতা থেকে 48 কি. মিটার দূরে নদীয়া জেলার বড়জাগুলিয়া গ্রামে ছিল তাঁদের আদিবাড়ী কিন্তু জীবিকার জন্য কলকাতাতেই বাসা বেঁধেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখানেই 1894 খৃস্টাব্দে 1লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ছয় কন্যা ও একপুত্রের জনক সুরেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁর সহধর্মিণী আমোদিনী দেবী জ্যেষ্ঠ সন্তান সত্যেনের বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে গৌরববোধ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথও পিতামাতার প্রতি চিরদিন অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। 96 বছর বয়সে 1964 খৃস্টাব্দে পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করেন। স্বামীর স্বল্প আয়ে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে সুপরিচালিত করার নিরন্তর সংগ্রামে ভগ্নস্বাস্থ্য আমোদিনী দেবী এর বহুপূর্বেই 1939 খৃস্টাব্দে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। তখন রাজনীতিক ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভারত নবযুগে পদার্পণ করছিল। বাল্যেই স্বদেশী আন্দোলনের হাওয়া সত্যেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে। নবজাগরণের হোতারা দেশকে সর্ব প্রকারে স্বনির্ভর করে তোলার স্বপ্ন দেখছিলেন। সেই স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠত হিন্দুমেলার বার্ষিক প্রদর্শনীতে। শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে নতুন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। 1896 খৃস্টাব্দের শিল্প প্রদর্শনীটি ছিল এই স্বদেশিয়ানার জোয়ারের সর্বোচ্চ ঢেউ। স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল এবং দিকে দিকে স্বদেশী দোকান খোলা হতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন এই আন্দোলনের অগ্রণীদের অন্যতম। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি শিল্পোদ্যোগের স্রষ্টা ছিলেন তিনি। এই সংস্থাটি ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সমসাময়িক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয় এই লগ্নে। তরুণদের মনে জেগে ওঠে এক অদম্য উৎসাহ, নিজ নিজ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার চরম বিকাশ ঘটিয়ে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এদেরই একজন।

পাঁচ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের লেখাপড়া শুরু হয় বাড়ীর নিকটেই নর্মাল স্কুলে। একসময়ে রবীন্দ্রনাথও ছাত্র হিসাবে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন এই স্কুলে। পরে যখন বসু পরিবার গোয়াবাগানে 22 নং ঈশ্বর মিল লেনে তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে উঠে যান তখন সত্যেন্দ্রনাথকে পাশের নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়। উঠতি মূলোকে বোধহয় পত্তনেই চিনেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, তাই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশ যাতে তীব্রতর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্যকভাবে হয় তার ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন তিনি। ইণ্ডিয়ান স্কুলে অধ্যয়নের মেয়াদ ফুরোলেই সত্যেন্দ্রনাথকে ভর্তি করেছিলেন সে যুগের ঐতিহ্যময় শিক্ষায়তন "হিন্দু স্কুলে"। সেখানে তাঁর বিকাশমান প্রতিভার স্বীকৃতির কথা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে। 1938 খৃস্টাব্দে চোদ্দ বছর বয়সে

* 91, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-700 019

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার ঠিক দু-দিন আগে তাঁর জলবসন্ত রোগ হয়। তাই হিন্দু স্কুলে এক বছর আরও থাকতে হল। বলাবাহুল্য সময়টি বৃথা যায় নি। সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চগণিত এবং সংস্কৃত ধ্রুব সাহিত্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পঞ্চম স্থান অধিকার করে। ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে।

1911 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সত্যেন্দ্রনাথ। পরবর্তী চারটি স্থান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন পরপর এই চারজন— মাণিকলাল দে, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং প্রাণকৃষ্ণ পারিজা। ঐ পরীক্ষায় শারীরবিজ্ঞান ছিল সত্যেন্দ্রনাথের চতুর্থ বিষয়। তাতে তিনি 100র মধ্যে 100 নম্বরই পান।

বি. এস-সি ক্লাসে মুখ্য পাঠ্য হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ,, নিখিল রঞ্জন সেন এবং মেঘনাদ সাহা মিশ্র গণিত বেছে নেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং পুলিনবিহারী সরকারের মনোনীত বিষয় ছিল রসায়ন। শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমরেশ চক্রবর্তী এবং স্নেহময় দত্ত পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। প্রাণকৃষ্ণ পরিজার বিষয় ছিল উদ্ভিদবিদ্যা। একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীর্থদের এই দলটির মধ্যে পাঁচজন পরবর্তীকালে স্বল্প ব্যবধানে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতিপদে বৃত হন। 1913 খৃস্টাব্দে বি. এস-সি গণিত অনার্সের পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ এবং নিখিলরঞ্জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে পরপর প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন। 1915 খৃস্টাব্দে এম. এস. সি মিশ্র গণিতের পরীক্ষায় এই ফলেরই পুণরাবৃত্তি ঘটে। মিশ্রগণিতে সত্যেন্দ্রনাথ মোট 800 নম্বরের মধ্যে 736 নম্বর পেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন যা আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারে নি।

1914 খৃস্টাব্দে বিশ বছর বয়সে এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন কলকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা উষাবতীর সঙ্গে। বলাবাহুল্য সে যুগের রীতি অনুসারে পাত্রী মনোনয়নের ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের করণীয় কিছুই ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর মার কথাই ছিল শেষ কথা। তবে যুবক সত্যেন্দ্রনাথ একটি সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সেটি হল পণ প্রথা। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বিবাহে সম্মতি তিনি একটি শর্তে দেবেন, পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে কোনরূপ পণ দাবী করা চলবে না। উভয় পক্ষই তাঁর এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। যখন বিবাহ হয় উষাবতীর বয়স তখন ১১ বছর মাত্র। তিনি লেখাপড়া করেছিলেন প্রথমে নিবেদিতা স্কুলে এবং পরে মহাকালী পাঠশালায়, উৎসাহী স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ইংরেজী পড়া আরম্ভ করতে হল। উষাবতী নয়টি সন্তানের জননী হন। এদের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা তাদের শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে, বাকী সাতজনকেই সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত করে গেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মত একজন শিল্পমনা এবং নানাবিধ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে ইংরেজী ভাষায় দখল থাকা হয়তো স্বাভাবিকই মনে হবে। 1944 খৃস্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর সাধারণ সভাপতির ভাষণটি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গদ্য রচনার একটি আদর্শ স্বরূপ হয়ে আছে। ছাত্র বয়স থেকেই ইংরেজী ছাড়া ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষার এলাকায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর প্রেরণা ও আনন্দের উৎস ছিল হুগো, গ্যেটে এবং সংস্কৃত সাহিত্য। যৌবনেই তিনি প্রমথ চৌধুরী এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে আসেন এবং সবুজপত্রের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ এখানেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হন যাঁর লেখা তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল।

জনসাধারণকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার সমস্যার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ চিরদিন সজাগ ছিলেন। তিনি অচিরে উপলব্ধি করলেন যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রগতির প্রধান অন্তরায় হল বিদেশী ভাষা যার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। 1948 খৃস্টাব্দে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে জনপ্রিয় করার মানসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। সে যাবৎ পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে বাংলায় লেখা একটি বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে চলেছে যা পাঠক মহলে যথেষ্ট আদৃত। আজ পরিষদের নিজস্ব একটি বাড়ীও আছে যার নাম সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'সত্যেন্দ্রভবন' রাখা হয়েছে। পরিষদ থেকে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এছাড়া পরিষদ বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করে থাকে। পরিষদে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ একটিও বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করে আলোচ্য বিষয়টি সুললিত বাংলা ভাষায় পেশ করতে সক্ষম ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আপেক্ষিকতার মতন দুরূহ বিষয়েও তিনি সরল কথ্য বাংলায় পড়ানো চালু করেছিলেন।

1915 খৃস্টাব্দের কথা। মেধাবী এবং উদ্যমী ছাত্রদের একটি দল এম. এস-সি কোর্সে পড়া শেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হয়ে গেলো। তাঁর সুদূরপ্রসারী সন্ধানী দৃষ্টিতে এই ছাত্রদের মেধা এবং প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎ সহজেই ধরা পড়ল এবং স্যার আশুতোষ তাদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে সদ্য চালু পদার্থবিদ্যা এবং ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ক্লাসগুলি চালাবার ভার অর্পণ করলেন। পরের বছর সত্যেন্দ্রনাথ রিসার্চ স্কলার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। আর এক বছর পরে তিনি এবং মেঘনাদ সাহা যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা এবং ফলিত গণিত বিভাগে

লেকচারারের পদে নিযুক্ত হলেন। স্নাতকোত্তর ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর কাজটা তাঁরাই সামলাতেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগে Theory of Heat, Thermodynamics and Spectroscopy এবং গণিত বিভাগে Thermondynamics পড়াতেন সাহা। সত্যেন্দ্রনাথ দক্ষ উভচরের মত দুটি বিভাগেই আরও নিয়মিত আনাগোনা করতে লাগলেন। General Physics পড়ান ছাড়া তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল নবাগতদের সামনে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার একটা বোধগম্য চিত্র তুলে ধরা। Differential Equation, Harmonic Analysis প্রভৃতি ছিল পাঠ্য বিষয়। গণিত বিভাগে তিনি স্থিতিস্থাপকতা এবং আপেক্ষিকতাও পড়াতেন।

তাঁরা দু-জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞান কলেজটিকে উন্নত করে একটি আন্তর্জাতিক স্তরীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার কাজটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে এটি ছিল একটি উদ্দীপনাময় যুগ। ওপেন-হাইমারের ভাষায়, "যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জন্য এটা ছিল একটা সৃজনের যুগ। তাঁদের নবীন অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিও ছিল।"

পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় শাখা থেকে আহরিত বিষয়ের নানাবিধতা সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণার রাজ্যকে করেছিল বিস্তৃত। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় তাঁর প্রথম মূল্যবান অবদান হল Equation of state সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে একযোগে লিখিত একটি নিবন্ধ। নিবন্ধটি On the influence of finite volume of molecules on the equation of state নামে 1918 খৃস্টাব্দে Philosophical magazine-এ ছাপা হয়। এরপর দুটি নিবন্ধ The stress equations of equilibrium এবং On the Horpolhode নামে 1919 খৃস্টাব্দে Bulletin of Calcuta Mathematical Society পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরের বছরে তিনি Philosophical Magazine-এ আরও দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রথমটি On the equation of state (যুগ্ম লেখক মেঘনাদ সাহা) এবং দ্বিতীয়টি On the deduction of Rydberg's law from the quantum theory of spectral radiation. শিরোনামে। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আপেক্ষিকতার মূলতত্ত্ব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যাতে আইনস্টাইন এবং মিনকাউস্কির মৌলিক নিবন্ধগুলির মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু কৃত অনুবাদ ছিল। এতে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা লেখন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

1920 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বহুসংখ্যক সমর্থী বিজ্ঞানীদের নিকট-সমাবেশ এবং ল্যাবোরেটরীতে স্থান, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির অপ্রতুলতা সমস্যাকে করে তোলে সঙ্গীন। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ায় একটু সুরাহা হয়। পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। 1921 খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের রীডার হিসাবে সেখানে যোগ দেন। ক্লাস নেওয়া এবং প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ছাত্রদের পরিচালনার কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হলেও সর্বদাই তাঁর প্রধান নজর ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার দিকে। সুতরাং অবসর সময়ের বেশীর ভাগই তাঁর কাটত প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর এবং সমারফেল্ড প্রমুখের মূল রচনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার কাজে। তাঁর জীবনের এই অংশটা ছিল গভীর অধ্যয়ন এবং প্রস্তুতির কাল। যে মানসিকতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্যার মধ্য দিয়ে যেতে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ছাত্রদের উদ্দেশে এই সময়ে দেওয়া তাঁর উপদেশের মধ্যে। "কোন ধারণাকেই ততক্ষণ গ্রহণ করবে না যতক্ষণ তুমি নিজে তার ভিত্তির সুসঙ্গত এবং যুক্তিনিষ্ঠ কাঠামোটিকে পরখ করে সন্তুষ্ট না হচ্ছ। বিজ্ঞদের লেখাগুলো মন দিয়ে পড়। অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে একমাত্র তাঁদের অবদানই প্রকৃত মূল্য রাখে। অল্পজ্ঞরা সবক্ষেত্রেই জটিল স্থানগুলিকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে যান।"

এই সময় ডঃ ডি. এম. বোস সত্যেন্দ্রনাথকে একটি বই উপহার দেন। ম্যাক্স প্লাঙ্কের Thermodynamik und warmestrahiung "নামক এই গ্রন্থখানি এর আগে তাঁর নজরে পড়ে নি। বাস্তবিক পক্ষে সে সময়ে quantum of action বিষয়ে প্লাঙ্কের বিরাট আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝবার মত লোক কমই ছিল। 1924 খৃস্টাব্দে সাহা এসে উপস্থিত হলেন ঢাকায়। এম. এস-সি. প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে। তিনি পাওলির সদ্য প্রকাশিত একটি লেখার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিকিরণ সমস্যাটি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ গভীর চিন্তা করলেন এবং black body radiation-কে মুক্ত ফোটোন গ্যাস ধরে নিয়ে স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার সমাধান করতে মনস্থ করলেন। ফোটোন গ্যাসের থার্মোডিনামিক্স নির্ভুল ভাবে ব্যবহার করে তিনি প্লাঙ্কের বিকিরণ ফরমূলায় এসে উপনীত হলেন। 'Planck's law and light quantum hypothesis' নামক নিবন্ধটি সত্যেন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের কাছে এই অনুরোধ করে যাতে লেখাটি উপযুক্ত মনে হলে Zeitschrift für physik-এ ছাপা হয়। আইনস্টাইন নিজেই লেখাটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত করলেন এবং তলায় মন্তব্য করলেন যে বোসের এই কাজটিকে এক ধাপ অগ্রগতি বলে তিনি মনে করেন এবং তিনি অন্যত্র দেখাবেন যে এই পদ্ধতি প্রয়োগে আদর্শ গ্যাসের quantum theory-ও পাওয়া যায়।

এর কিছু পরেই সত্যেন্দ্রনাথ "Thermodynamic equilibrium in radiation field in the presence of matter" নামক তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধের

পাণ্ডুলিপিটিও পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনের কাছে একই উদ্দেশ্যে। আইনস্টাইন এটিকেও জার্মান ভাষায় অনূদিত করে উপরিউক্ত পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন কিন্তু এবার তলায় তাঁর নিজের মন্তব্যটি অনুকূল হয় নি। তিনি ঐ নিবন্ধের কোন কোন অংশের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। পরবর্তীকালে যখন দু-জনের বার্লিনে সাক্ষাৎ হয় তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় খোলাখুলিভাবে। দীর্ঘ আলোচনা হলেও কেউ কাউকে নিজ মতে আনতে সক্ষম হলেন না। ফলতঃ এই দ্বিতীয় নিবন্ধটি তাঁর নিজের কাছে বেশী মূল্যবান মনে হলেও যথোচিত সমাদর লাভ করতে পারে নি। তিনি চিরদিন এটিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করতেন এবং এই আশা পোষণ করতেন যে ভবিষ্যতে কোন বিজ্ঞানীর চোখে তাঁর বক্তব্যটি ঠিক ঠিক ধরা পড়বে ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কাজ দুটিকে কেন্দ্র করে বোস এবং আইনস্টাইনের মধ্যে কয়েকটি পত্র বিনিময় হয় এবং তিনি যখন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দু-বছরের ছুটি চাইলেন বিদেশে গিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির মানসে তখন তাঁর আবেদন মঞ্জুরের ব্যাপারটি সহজ ত্বরান্বিত হয় আইনস্টাইনের ঐ সব চিঠির বলেই। 1924-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বম্বে থেকে জাহাজে চেপে পাড়ি দিলেন বার্লিন অভিমুখে। প্যারিসে এসে উঠলেন ভারতীয় ছাত্র পরিষদের ডেরায়। সরাসরি বার্লিনে না গিয়ে প্যারিসেই কিছুকাল কাটালেন সত্যেন্দ্রনাথ। প্রবোধচন্দ্র বাগচি তখন ঐখানেই থাকতেন। তিনি প্রোফেসর সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, বিখ্যাত ফরাসী ভারতবিদ্যাবিশারদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। লেভি তাঁকে কলেজ দ্য ফ্রান্সের অধ্যাপক পল লাঞ্জেভিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একটি পত্র দেন।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক—উভয় শাখার বর্তমান অগ্রগতির পরিচয় জানতে বিদেশে গেছিলেন। নিজের আন্তরিক প্রবণতাকে অনুসরণ করে মাদাম কুরির নিকটে তেজস্ক্রিয়তার এবং মরিস দ্য ব্রগলির নিকটে এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপির পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করার দিকেই তিনি ঝুঁকলেন। লাঞ্জেভিন তাঁকে পরামর্শ দিলেন মাদাম ক্যুরির ল্যাবরেটরীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ নিতে, তাতে স্বয়ং মাদাম ক্যুরির সঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনাও থাকবে। লাঞ্জেভিনই তাঁকে একটি চিঠি দিয়ে মাদাম ক্যুরির কাছে পাঠালেন। সাক্ষাৎকারের সময় মাদাম ক্যুরি ইংরেজীতেই কথা শুরু করলেন। বোস তাঁকে বললেন যে তিনি প্যারিসে ছয় মাস থাকবেন এবং ভাষাও শিখে নিতে পারবেন কিন্তু মাদাম ক্যুরির অসীম ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি একথা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন যে ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার মত ফ্রেঞ্চ ভাষা তাঁর ভালভাবেই দখলে ছিল।

এক্স-রে স্পেক্ট্রোস্কোপির সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল একথা লাঞ্জেভিন শুনেছিলেন তাই তিনি মরিস দ্য ব্রগলির কাছেও একটা চিঠি দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে পাঠালেন। মরিস দ্য ব্রগলি সত্যেন্দ্রনাথের কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, কাজেই তিনি তখনই সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রধান সহকর্মী আলেকজাণ্ডার দোভিলিয়েরের সঙ্গে কাজ করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে তিনি এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফীর নানাবিধ কৌশল শিখলেন। ক্রিস্ট্যালের প্রকৃতির তাত্ত্বিক দিকটাও তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করল। এই ল্যাবরেটারীতে আহরিত জ্ঞান পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কে. এস. কৃষ্ণন এবং তাঁর ছাত্র দলকে ক্রিস্ট্যাল চৌম্বকত্ব বিষয়ক গবেষণায় সাহায্য করতে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে।

প্যারিসে বছরখানেক অতিবাহিত করে সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনে যান এবং 1925 খৃস্টাব্দের 8ই অক্টোবর তারিখে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রার্থনা জানিয়ে পত্র দেন। আইনস্টাইন সে সময়ে তাঁর বাৎসরিক পরিভ্রমণে লীডেনে ছিলেন। অভিলষিত সাক্ষাৎকারটি বাস্তবায়িত হয় কয়েক সপ্তাহ পরে। এর মধ্যে আইনস্টাইন বসু-সংখ্যায়ন প্রয়োগ করে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি তাঁর কাজের ক্ষেত্রটি পালটিয়ে ইউনিফাইড ফীল্ড থিওরি প্রাথমিক সন্ধানের দিকে সরে এসেছিলেন। কাজে কাজেই বোসের আর আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করা হল না। বলা বহুল্য তাঁদের এই সাক্ষাৎকারটি মূল্যহীন ছিল না। আইনস্টাইন জানতে চাইলেন যে প্লাঙ্কস ল বের করার এই অভিনব পদ্ধতিটি তাঁর মাথায় খেলল কি করে। তিনি আরও জানতে চাইলেন যে বোসের স্ট্যাটিস্টিক্স ইন্টারএকশন অফ কোয়াণ্টার ক্ষেত্রে নতুন কোন আলোকপাত করে কিনা এবং বোস বিশদভাবে সেটি কষে দিতে পারেন কিনা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধিটিকে বিস্তৃত করার ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন বেশী। সুতরাং আইনস্টাইন তাঁকে পদার্থবিদ্যার আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক নেওয়ার সুযোগ করে দিতে কর্তৃপক্ষকে একটা চিঠি করে দিলেন। এই সুযোগের ফলে তিনি ফ্রিজহাবের, অটোহান, লীজে মাইৎনের, ওয়ালথের বোথে, মাইকেল পোলানী, ফন লাউয়ে, ওয়াল্টার গর্ডন, ইউজীন ভিগনের এবং আরও অনেক প্রথম শ্রেণীর জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে দেখা করতে এবং ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারলেন। পোলানীর ল্যাবরেটারীতে তিনি এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফীর কাজে নিজেকে নিযুক্ত করলেন এবং গর্ডনের (ক্লাইন-গর্ডন ইকোয়েশনখ্যাত) সঙ্গে অধ্যয়নে মেতে গেলেন। হান এবং মাইৎনেরের রেডিও-একটিভিটি ল্যাবরেটারীতে তিনি প্রায়ই যেতেন। ইতোমধ্যে 1925 খৃস্টাব্দে হাইসেনবার্গের কোয়াণ্টাম মেকানিক্স সম্পর্কিত নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইন এদিকে বেশ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি বোসকে এদিকে কাজে লাগাতে চাইলেন। বোস গর্ডনের সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করলেন এবং এই নতুন

(শেষ অংশ 43 পৃষ্ঠায় দেখুন)

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন বুঝেছি

শিবচন্দ্র ঘোষ*

স্বয়ং আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ যাঁর গুণমুগ্ধ, প্ল্যাঙ্ক—শ্রডিংগার—হাইজেনবার্গ-হান—বোর, পাউলি— ফেমি—ডিরাক-এর সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান ও আন্তরিক যোগাযোগ সেই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কার 'বোস-সংখ্যায়ন—আধুনিক পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিশারী। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও অবদানের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ পরিচয় থাকে না। তাই তাঁরা সেই আবিষ্কারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেন না। 'বোস-সংখ্যায়ন' এমনই এক অনন্যসাধারণ অবদান।

শুধু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে নয়, পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞান, জৈব রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর আবিষ্কার ও মৌলিক চিন্তার অবদান সমকালকে ছাপিয়ে চিরকালের ওপর তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কৈশোরে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় গণ-জাগরণের যুগ। যেন এক আবেগরুদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। সমস্ত জাতির মনের মরাগাঙে প্রাণের বান ডেকেছে। স্বদেশী আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মাথায় নেমে এসেছে বিদেশী ইংরাজ শাসকদের চণ্ড দমন নীতি। সেই অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে স্বাদেশিকতায় সত্যেন্দ্রনাথের দীক্ষা হয়েছে। ছাত্রাবস্থায়ই প্রতি সন্ধ্যায় অবসর সময়ে শ্রমজীবীদের নৈশবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষকতা আর আর্তত্রাণ সমিতিতে দরিদ্র পাড়িতের সেবাশুশ্রূষার মাধ্যমে দেশের আসল মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিস প্রমুখ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং সতীর্থ হিসাবে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল রঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কৃতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সমাবেশ ও ভাব বিনিময়। শুধুই কি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, তাস, পাশা, দাবা, ক্যারাম, ফুটবল সবেতেই মাথা, সবেতেই ঝোঁক।

দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছু জানার গভীর আগ্রহে ও অন্তহীন কৌতূহলের বশে স্কুলজীবনে হেদুয়ার আড্ডা থেকে ঢাকায় অধ্যাপনাকালে 'বারোজনার আসর', কলকাতার 'শনিবারের বৈঠক', 'বিচিত্রা'র সভা, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আর 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর, কিশোর-কিশোরীদের নানা আসরে—সর্বত্রই তিনি গেছেন সব কিছু জানবার ও অপরের সঙ্গে আপন মনের ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। এই ভাবে নানা ঘটনা ও ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও টানাপোড়েনে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনীষা ও জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা ঘটেছে। স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় "জ্ঞানের রাজ্যে এখন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন চলছে। কোন বিষয়ের জ্ঞানকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—এদের শিকড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই ভালো কিছু করতে গেলে চট করে করা যায় না। অনেক জানতে হয়, গভীর ভাবে ভাবতে হয়।' অথচ অনেকের ভুল ধারণা সত্যেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিশ্রমী নন, তাঁর শক্তি আছে কিন্তু তিনি মজলিসী মেজাজের মানুষ। তিনি জীবনের শেষভাগেও মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বক তত্ত্ব একই সঙ্গে আলোচনার উপযোগী একীকৃত ক্ষেত্রবাদ সম্পর্কে একান্ত প্রয়োজনীয় চৌষট্টিটি সহ-সমীকরণের অতি সাধারণ, সম্পূর্ণ, সঠিক সমাধান করে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একীকৃত তত্ত্বে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের আরও গবেষণা আছে। তাঁর গবেষণায় একীকৃততত্ত্ব বিশেষ ভাবে উপকৃত। সত্যেন্দ্রনাথের উচ্চতাত্ত্বিক গবেষণাকে নেহাৎ বুদ্ধির বিলাসিতা বা ভাব বিলাসিতা বলে অনেকেই মনে করেন। এই কথা সত্যেন্দ্রনাথকে বলা হলে তিনি বলেন 'নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের বাইরে যা কিছু তাকেই কি তোরা বিলাসিতা বলবি? এরকম বিলাসিতা না থাকলে দেশ চলবে কি করে, সভ্যতার অগ্রগতি হবে কি করে?'

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ভারতীয় মনীষার সমন্বয়ের মূর্তপ্রতীক এই মহাবিজ্ঞানীর বিরাট পাণ্ডিত্য কিন্তু তাঁর হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে কোমল মানবিক বৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করে নি।

বিস্ময়ের কথা এই যে পোষাকে—আহারে, রুচিতে—মেজাজে

---

42 পৃষ্ঠার পরের অংশ

থিওরির ধারাটিকে বুঝতে চেষ্টা করলেন। আইনস্টাইনের আগ্রহ কিন্তু ততদিনে নিভতে শুরু করেছে। তিনি থিওরীটিকে চূড়ান্ত কিছু বলে মেনে নিতে পারলেন না। এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার দরুণ সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু আইনস্টাইনের সঙ্গে আপেক্ষিকতা, ইউনিফায়েড ফীল্ড থিওরী এবং হিলবার্টের থিওরী নিয়ে অনেক ফলপ্রদ আলোচনা করার অবকাশ পেলেন। 1926 খৃস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বোস গটিংগেনে গেলেন এবং সেখানে ম্যাক্স বর্ণ এবং এরিক হুকেলের সঙ্গে দেখা করেন। এই-ভাবে বোসের প্রথম ইউরোপ ভ্রমণটি তাঁর পক্ষে বেশ লাভজনকই হয় যদিও তিনি কোন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ করেন নি। 1926 খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় ফিরে জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু করেন।

---

* 11/2, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলিকাতা-700006

আর পাঁচজন বাঙালীর মতোই একেবারে সাধারণ ছিলেন এই অতি অসাধারণ বিজ্ঞানী। একান্ত আত্ম-প্রচার বিমুখ, আপন-ভোলা, নিঃস্বার্থ এই জ্ঞান-তাপস আপন জ্ঞানের গরিমায় জন-জীবনের মূলধারা থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে গবেষণাগারের নীরব বিচ্ছিন্নতাকে বরণ করে নেন নি। কি ছাত্র, কি সাধারণ মানুষ যখনই যার কাছ থেকে ডাক এসেছে তাঁর কাছেই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনই ছিল সকলের প্রতি তাঁর প্রাণ-ঢালা ভালবাসা।

'তরুলতা সহজে তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী; কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ, আজীবন শিক্ষাব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ সমাজে পরিবর্তনের প্রয়োজনে আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার উপদেশ দিয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন নয়, আমাদের চেতনায়, আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও প্রসঙ্গের কথাই তিনি তাঁর নিজের লেখায় ও বক্তৃতায় বারবার বলেছেন।

কিন্তু আমাদের অর্থাৎ 'মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে না, মানুষের অস্তিত্বই তার চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের যে সত্তা, জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে উৎপাদন ব্যবস্থা, সেই অনুসারেই সেই সমাজের চিন্তা, ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অবশ্যই সর্বকালে সর্বঅবস্থায় উৎপাদন বলতে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় প্রভৃতির সামাজিক উৎপাদন বোঝায়। আবার উৎপাদন বল ও উৎপাদন সম্পর্ক এই দুইয়ে মিলেই গঠিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা।

উৎপাদনের যন্ত্রাদি, মানুষের শ্রম, শ্রমের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যার সাহায্যে মানুষ উৎপাদন করে এই সব কিছু মিলিয়েই হল উৎপাদন বল। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বলা হয় উৎপাদন-সম্পর্ক। এটা পরিষ্কার বোঝা দরকার যে উৎপাদন-বল উৎপাদনের ব্যাপারে শুধু সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও দ্রুত আমূল পরিবর্তন সৃষ্টিকারী উপাদানই নয় পরন্তু তা উৎপাদনের গতি ও প্রকৃতিকেও নিরূপিত করে।

সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে উৎপাদন বলকে আরো বিকশিত ও উন্নত করার তাগিদে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে নূতন নূতন উৎপাদনের উপকরণ, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ঘটেছে। আবার উৎপাদন যন্ত্রাদির বিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমকুশলতা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বেড়েছে আর তার চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই সমাজের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির প্রযুক্তি ও প্রভাব এত ব্যাপক, গভীর ও সুদূর প্রসারী যে কোন বিজ্ঞানীই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামাজিক দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে উৎপাদন বল তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার নিয়ামক ভূমিকার এই সব বিষয়েই সত্যেন্দ্রনাথ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কেও সবিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই এক দিকে আসন্ন পরমাণু যুদ্ধের বিধ্বংসী বিভীষিকা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, অন্যদিকে জ্যোতিষীগণনা, হস্তরেখাবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে বারে বারে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য রেখেছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ক্রান্তদর্শী, যিনি যে কোন ঘটনার শেষ পর্যন্ত দেখতে পেতেন এবং শেষকে অতিক্রম করেও দেখতে পেতেন। মনের গভীর উপলব্ধি থেকে দেখতে পেলেন যে 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা'র নামে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহার সৃষ্টি করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার নামে ভারতের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে সমাজের নীচু তলায় পশুর পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন এই ভ্রান্ত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসগুলি স্বাধীনভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চায় বাধা সৃষ্টি করছে এবং সমাজের বিকাশ ও প্রগতি ব্যাহত করছে। তিনি বুঝেছিলেন কালের নিরিখে এরা অকেজো ও বাতিল হওয়ার যোগ্য। এরা ক্ষুধা, দারিদ্র আর সামাজিক অন্যায়কে জিইয়ে রাখতে চায়। তিনি বার বার বলেছেন যে আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে পুরানো মান্ধাতা আমলের কুসংস্কার ও জড়তার রেশ ও অবশেষগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হলে সমাজকে যেমন বিজ্ঞান-সচেতন হতে হবে বিজ্ঞানীকেও তেমনই সমাজ-সচেতন হতে হবে।

সমষ্টির সংখ্যায়নে বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথের ছিল এমনই সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যে তাঁর কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কে রহিত একক বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির ভূমিকা নেহাত গৌণ ও তাৎপর্যহীন। এই সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনও বটে। তাঁর দৃষ্টিতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা সমগ্র জাতির উন্নতির মাপকাঠি নয়; সমাজের বিরাট অংশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ও উন্নতিতেই সমাজের অগ্রগতির পরিচয়। তাই গোটা সমাজের জন্য চিন্তা ভাবনা করতেই মানসিকভাবে অভ্যস্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এটাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচেতনার মর্মবস্তু।

মাতৃভাষা 'বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু কয়েকজন বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় 1948 খৃস্টাব্দে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং বাংলা ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে সুপ্ত বিরাট বটবৃক্ষের প্রতিশ্রুতির মতো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও তেমনই গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের বিরাট প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনাপূর্ণ। আজ দেশে

(শেষ অংশ 45 পৃষ্ঠায় দেখুন)

পরিষদ সংবাদ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম-বার্ষিকী

1লা জানুয়ারী 1984 সকাল 10টায় সত্যেন্দ্র ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 90তম জন্ম-বার্ষিকী পালিত হয়। প্রারম্ভে পরিষদের হাতে-কলমের ছাত্র-ছাত্রীগণ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে, পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এর পর একে একে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডাঃ গুণধর বর্মন, ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ সুকুমার গুপ্ত, শিবচন্দ্র ঘোষ। সভাশেষে আচার্য বসুর বাসভবনে গিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পঞ্চানন পাল

---

44 পৃষ্ঠার পরের অংশ

বাংলাভাষার মাধ্যমে যতটুকু বিজ্ঞান চর্চার সাড়া জেগেছে তার উপর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

বাস্তবিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে বাংলাভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি তাঁদের ইংরাজী ভাষার মোহ ও অভিমান ত্যাগ করে দল-মত নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়াকারে প্রচার করতে পারেন তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিজ্ঞান মানসিকতার সৃষ্টি হবে তা আমাদের সনাতন সমাজের অচলায়তনে গতিবেগ সঞ্চারে হবে এক প্রচণ্ড শক্তি।

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল বাংলাভাষী মানুষের কাছে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলাভাষী সকল মানুষ যদি এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের প্রাণের জিনিস মনে করে একে গ্রহণ ও লালন-পালন করেন তবেই হবে মানবদরদী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার প্রতি স্থায়ী ও উপযুক্ত সম্মান। নয়তো এই মহান শান্তিবাদী জ্ঞান-তাপসকে শুধু তাঁর নবতিতম জন্মবর্ষে স্মরণ করেই আমরা কি আমাদের কর্তব্য সমাধা করবো? তাঁর অক্ষয় গৌরবের গতানুগতিক অলস স্মৃতিচারণ করে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হয় না, চাই তাঁর আদর্শ রূপায়ণে সবার সক্রিয় ভূমিকা।

দমদম শেঠবাগানের লাইব্রেরী হলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

26শে জানুয়ারী দমদম শেঠবাগান লাইব্রেরী হলে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত। প্রদর্শনীটি সকলের নিকট আকর্ষণীয় হয়। সভায় আলোচনা করেন পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম সহযোগী কর্মসচিব তপন বন্দ্যোপাধায় ও কার্যকরী সমিতির সদস্য চাণক্য সেন।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের 130তম পূর্তি উৎসব

গত 20.1.84 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নদীয়ার শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চবিদ্যালয়ে 130তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। প্রদর্শনী চলে 20 থেকে 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে পোস্টার প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়। সহযোগিতা করেন সহ-সভাপতি ডাঃ গুণধর বর্মন, কার্যকরী সমিতির সদস্য চাণক্য সেন, বাবলু সেনগুপ্ত ও পরিষদ কর্মী দুলাল পাত্র।

প্রদর্শনীতে আলোচ্য বিষয় ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পোস্টার প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল আচার্য বসুর বাণী, পরিবেশ দূষণ রোধ, কিভাবে সর্প দংশন থেকে বাঁচা যায় এবং পরমাণু বোমা তৈরি এবং ব্যবহারের কুফল।

দুলালচন্দ্র পাত্র

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

25শে জানুয়ারী 1984, বিকাল 5টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 36তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিভিন্ন শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর তাঁর বক্তব্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে গোয়াবাগান সি. আই. টি. পার্কের নাম বদল করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ উদ্যান নামকরণের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র আচার্য বসুর পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু, কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন এবং আলোচনাচক্রে ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'সমাজ ও বিজ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু।

পঞ্চানন পাল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 36তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে কর্মসচিবের ভাষণ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর, সমবেত সুধিবৃন্দ,

পরিষদের 36তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আপনাদের সকলকে আমি পরিষদের পক্ষ থেকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। এবারকার প্রতিষ্ঠাদিবস অন্যান্য বারের থেকে একটু বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বছরই আচার্য বসুর 90তম জন্মবার্ষিকী। আচার্য বসু শুধু বিরাট বিজ্ঞানীই ছিলেন না তিনি ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল রায়ের মত বিরাট মানবদরদী। তারই প্রতিফলন এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা পাওয়ার অল্প কয়েক মাসের মধ্যে আচার্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। 1948 খৃষ্টাব্দের 25শে জানুয়ারী। পরিষদের কোন ভবন না থাকায় প্রথমে বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং পরে ফেডারেশন হলের একতলে পরিষদের কাজকর্ম সুরু হয়। সেই সময় তাঁকে এই কাজে বেশ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তখন অনেকেরই ধারণা ছিল বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান লেখা বা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু তিনি সকল বিরোধিতাকে অতিক্রম করে তাঁর কয়েকজন সুহৃদ ও গুণমুগ্ধ ছাত্রদের সহায়তায় এই পরিষদ স্থাপন করেন ও পরিষদের মুখপত্র মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা বাংলাভাষায় প্রকাশ সুরু করেন। সাধারণ মানুষের জন্য ও দেশের জন্য যে তাঁর মন সর্বদা ব্যথায় ভরে থাকত, সেটা তাঁর লেখার মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রারম্ভে বিরাট তাত্ত্বিক তথ্য বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে দান করলেও পরের দিকে এই ধরণের দান থেকে বিজ্ঞানের ভাণ্ডার বঞ্চিত হয়। এর কারণ—তখন তাঁর মন ছিল দেশ ও মানুষের কল্যাণের চিন্তায় বিভোর। তাঁর চিন্তা ও কথা সেই সময়কার প্রশাসন বুঝতে চান নি। সাধারণ মানুষের কল্যাণে শিক্ষার দুয়ার খুলে দেওয়ার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনের কথা তিনি বার বার বলে এসেছেন। তিনি বলেছেন—"ইংরেজীর উপর বেশী জোর দিলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন—তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কিভাবে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।" জাতীয় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিজেদের ভাষার মধ্য দিয়েই বুঝতে হবে আমাদের ঐতিহ্য কি এবং কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের মিলন ছিল।" তিনি আরও বলেছেন—"আমাদের আঞ্চলিক প্রেম ভাষার উপর নির্ভর করে না। সেটা আমাদের মনের কথা। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হবে।"

মাতৃভাষায় শিক্ষা দান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেদনাতুর চিত্তে বলেছেন—"যাঁরা বলেন, ইংরেজী যদি কম শেখানো হয় তাহলে আমাদের দেশের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হবে—যার মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞানের আলো ও স্বাধীনতার বাতাস, তাঁরা ভুল ধারণা করেছেন যে চিরকাল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উঁচু পাচিল থাকবে এবং আলো আসবে উপর থেকে যেটা কেবল মাত্র উপরতলার শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছবে এবং সেটা তাঁরা যেমন বুঝবেন সেইরকম নীচের তলার অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক।"

দেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করার দিকে তিনি বার বার প্রশাসনকে আহ্বান জানিয়েছেন—তিনি বলেছেন—"দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায় শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয় দেশের সাধারণ লোকেই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে।"

সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না তাঁদের চেষ্টা করতে হবে যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদের বুঝিয়ে দিতে। উদ্ভিদ ও জীবজগতের প্রতি মমতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"গাছপালা, জন্তুজানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় জিনিষ রয়েছে। প্রত্যেকেই আমাদের সত্যস্বরূপে পৌঁছে দিতে চায়।"

এই বিরাট চিন্তাশীল দেশ ও মানবদরদী বিজ্ঞানী যে গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করে গেছেন তা আমরা এখনও বিশেষ কিছুই করতে পারি নি। এই কাজ করতে হলে চাই—মানবদরদী কর্মী। এই ধরণের কর্মীর অভাবেই আচার্যের চিন্তাধারাকে পরিষদ এখনও সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে নি। তবু গ্রামবাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীরভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে বিজ্ঞানে কল্যাণময় রূপ তুলে ধরতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করতে এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে পরিষদ আজ বদ্ধপরিকর। এই কর্মসূচী রূপায়ণে অর্থের অভাব পরিষদের কাজকে ত্বরান্বিত করতে দিচ্ছে না। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নীতির জন্য জনদরদী সরকারের কাছে দেশের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমিও কৃতজ্ঞ। তাঁদের শিক্ষার নীতির বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে আচার্য বসুর প্রতি তাঁরা প্রকৃত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

আচার্য বসুর আবক্ষ মূর্তি সরকারী আনুকুল্যে গোয়াবাগান পার্কে স্থাপনের সম্মতি দেওয়ায় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। গোয়াবাগান পার্কের নামের পরিবর্তে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ উদ্যান নামকরণের জন্য পৌরমন্ত্রীর কাছে আমরা অনুরোধ করেছি। এই দুটি কাজই ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আর এক জনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আচার্য বসুর স্নেহধন্য এই বিজ্ঞানী পরিষদের জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল—আজ পরিষদ তাঁর অভাব উপলব্ধি করছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আচার্যের মানসকন্যা। আচার্যের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য পরিষদের কাজের মাধ্যমে পরিষদের উন্নতি সাধনকল্পে—সকলকে আজ সাদর আহ্বান জানাই।

সত্যকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

এই ৩৪তম

সাধারণতন্ত্র দিবসে

আসুন আমরা নতুন করে শপথ গ্রহণ করি—

- আমাদের সাফল্যগুলিকে স্থিতিশীল করে তুলি
- দেশ গঠনের কাজে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করি
- সর্ব্বপ্রকার সম্পদ সংগ্রহে প্রচেষ্ট হই
- অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করি এবং মিতব্যয়িতা পালন করে চলি

ভবিষ্যতের সকল কাজে প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাই

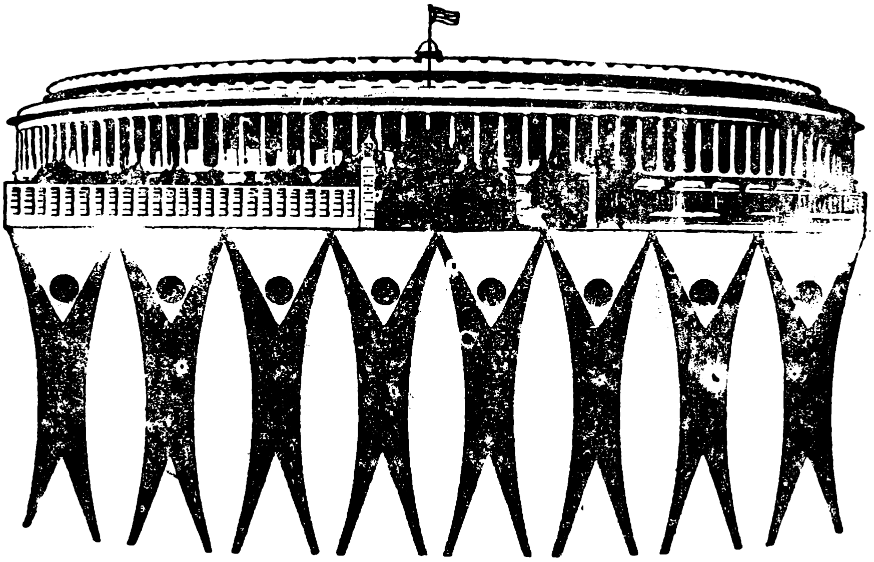

যে সমস্ত শক্তি আমাদের দুর্ব্বল করে তোলবার প্রচেষ্টায় রত তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

আজ এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তৈরী থাকুন

JNAN-O-BIJNAN
MONTHLY JOURNAL Regd. No. WB/NC-210 JANUARY 1984

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী, কলিকাতা—54 মূল্য—2.50